

তপ্ত ধূলার পথে, যাব ঝরা ফুলের রথে

তমোঘ্ন নস্কর

তিনি নেহাতই এক পরিব্রাজক। ঘর ছেড়েছিলেন দেশের টানে। তারপর মায়ের পায়ে অস্ত্র রেখে তুলে নিয়েছিলেন জপের মালা। নিজেই বলেন, তিনি তাপ্পিমারা ঝোলা কাঁধে পথে-পথে ঘুরে বেড়ানো এক মুসাফির। বাংলার এই ধুলোমাটিমাখা পথ হাঁটাই তাঁর নেশা।

পড়ে থাকা শুকনো বট-অশ্বত্থ-জারুলের পাতা, সর্ষের অহংকারী ক্ষেত, আমরুলের লাজবতী সবুজ, পুকুরঘাটের পৈঠা শ্যাওলায় জমে থাকা ঠাকুমা-খুড়ির গোড়ালি ঘষার দাগ, মাকড়শার জালে জমা শিশিরদানা—এইসব ঝুরঝুরে অতীত, বাংলার কস্তুরী-নাভিগন্ধ তুলে আনেন সন্তর্পণে, পরম মমতায়। ঝোলা ভরান।

পথে নামার আগে ঝোলা ঝেড়ে, উপুড় করে খালি করে দেন। তিনি সাধক, পরিব্রাজক ভূপেন্দ্রনাথ গোঠ বিশ্বাস।

মা বনদুর্গা কথা দিয়ে তাঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয়। এবার রইল যাত্রাপথ...

aranyamon.com



Rs : 275.00

মাতৃকথন

তপ্ত ধূলার পথে, যাব ঝরা ফুলের রথে

তমোঘ্ন নস্কর

অরণ্যমন প্রকাশনী

Matrikathan
by Tamoghna Naskar

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

অলঙ্করণ : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

প্রকাশক
চিরঞ্জীৎ দাস
অরণ্যমন প্রকাশনী
যোগাযোগ ৭২৭৮৯৯২৫৪০
aranyamon.com
aranyamononline@gmail.com

উৎসর্গ

সকল মা-কে

ভূমিকা

শীত কামড় দিচ্ছে বাগড়ি কুকুরের মতো। জপে বসি, জপ কাটে। মাংস-খুবলানো নদীর হাওয়ায় দাঁতকপাটি জোড়া লাগে না, তো নাম নেব কী?

গুরুদেব সব দেখছিলেন। এবার এসে ধুনি জ্বেলে দিলেন। কইলেন, "এই সকলই মায়া। ওপারে বোধ, এপারে মানব-প্রবৃত্তি। মাঝের পর্দাটি হল মায়া। খোদ মহামায়া সংসার, সম্পর্ক, অর্থ, কামনার সুতো দিয়ে এই মায়ার পর্দা বুনে দেন, আবার নিষ্ঠা দেখলে নিজেই পর্দা সরিয়ে নেন। তখন বোধি অর্থাৎ নির্বাণ প্রাপ্তি হয়।"

আমি ধুনির আগুনের তপ্ত শ্বাস বুকে ভরে ওমকার তুললুম...

ইনি হলেন বাবাঠাকুর ওরফে ভূপেন্দ্রনাথ গোঠ বিশ্বাস। বিপ্লবী থেকে হয়েছিলেন মাতৃসাধক। বাংলার মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছেন অনন্ত তৃষ্ণা নিয়ে; এ সেই তৃষ্ণার গল্প, যে তৃষ্ণা মিটেও মেটে না— বাংলার উপকথা, লোককথা, ব্রতকথা, যাপন আর মায়ের কথা...

সূচিপত্র

।। অপ্রচলিত মাতৃপূজন ।।

"বৈশাখের খরদুপুর। বাড়িতে খাবার তেমন কিছু নাই, ডান হস্তের শাঁখাখানাও বেড়েছে। অপেক্ষার প্রহর মা-কে ক্রোধান্বিত করে।

জ্ঞানবৃদ্ধ পতি তাঁর মানুষকে উদ্ধার অর্থাৎ শ্মশানস্বরূপ বৈরাগ্যের পথ দেখিয়ে বেড়ান। কিন্তু নিজে তো সংসারী, এমন উদাসীন হলে তো গৃহ চলে না।

মায়ের হাতে তালুতে গোটা বিশ্বসংসার। অঞ্চলপ্রান্তে কুঞ্চিকাগোছের মতো বদ্ধ আছে মানুষের সুখ, দুঃখ, ভাগ্য!

তাঁর ডান হস্তে সংসারের প্রসন্ন লক্ষ্মী, বাম হস্তে বৈরাগী, সন্ন্যাসীর ইষ্ট। সেই ডান হস্তের শাঁখা বেড়েছে, তিনি তো মা হয়ে উতলা হবেনই।

এদিকে মানুষটার হুঁশ নাই। ঘরে আর আসে না। শাঁখা নিয়ে ফেরার কথা। অবশেষে তিনি এলেন, বেলাদুপুর গড়িয়ে... মায়ের জগদ্দল ধৈর্যও তখন টুটে গেছে। তিনি শাঁখা চাইলেন আর উলটোদিকে পরমেশ্বর মস্ত জিভ কেটে বসলেন।

ব্যস! যা হওয়ার তা-ই হল। মা সব কিছু নিয়ে উঠলেন বাপের বাড়ি। আর তিনি ফিরবেনই না।

দিন যায় কাল যায়, মা আর ফেরেন না। এ-দিকে একলা পুরুষমানুষের সংসার যে চলে না। নন্দী, ভৃঙ্গি প্রভৃতি সাঙ্গোপাঙ্গরা বাড়া ভাত পায় না। তারাও "মা, মা" করে। বাবার মনটা হু-হু করে। অতএব বাবা ভোলানাথ মায়ের রাগ ভাঙাতে চললেন শাঁখারির বেশে।

শ্বশুরবাড়ির সন্নিকটস্থ গাছের তলায় এসে জামাই নিজের পসরা সাজিয়ে বসলেন। শ্বশুরবাড়ির কেউই জামাইকে চিনতে পারল না। কিন্তু মা ঠিকই চিনে নিলেন। মায়ের রাগ ভাঙল।

ভূ-লোকে তাঁদের সেই কালযাপন এক সন্তানের জন্ম দিল। সেই সন্তানকে পিতৃগৃহেই রেখে মা ফিরে গেলেন নিজ সংসারে। বিষয়টি বড়ো মর্মাহত করে ঠিকই, কিন্তু সে-সময় অভাবের সংসারে মাতুলালয় অনেকেই এমনভাবেই বড়ো হত। আর মায়ের তো বিশ্বসংসার। অভাব হবেই। যেন একখানা মস্ত ত্রিপল চাপা দিয়েছেন ধরাকে— এইদিক ধরে টানেন তো ওইদিক ফাঁকা হয়ে যায়। তা ছাড়া, জাগতিক জ্ঞানে তাঁর কর্মের দ্বারা আমাদের কর্মকে ঘষে দেওয়াও প্রয়োজন; নাহলে তো সবই অলৌকিক হত, তিনি নরেশ্বরী হবেন কী করে...

তা সেই কন্যা, মাতুলালয়ে নারীর পৃথিবীতেই বড়ো হতে লাগল। সেই মা-ই পরবর্তীকালে আমাদের মা দুর্গার মর্ত্যবাসিনী ক্ষুদ্র প্রতিরূপ মা বনদুর্গা।”

***

বাইরে বৃষ্টির বেগ বাড়ল। চণ্ডীমণ্ডপের টিনের চালে শিলের টুকরোগুলো পড়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে সফেদ ফেনার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। ছাট এসে মায়ের রেড়ির বড়ো প্রদীপের শিখাটিকে তরাস ধরালে। ছেদ পড়ল কাহিনিতে।

বাবাঠাকুর উঠে গিয়ে চাঁচের দোরটা টেনে দিয়ে এলেন। গায়ের ভিজে কাপড়টা ছেড়ে এসে বসলেন।

সাদা দাড়ির ওপর চিকচিক করছে জলবিন্দু। প্রদীপের কাঁপা শিখা যেন অজস্র আলোকবিম্ব তৈয়ার করে উদ্ভাসিত করে তুলেছে বৃদ্ধের মুখ। বৃদ্ধ শুরু করলেন আবার, “মায়ের

সন্তান হয়ে মর্ত্যে থাকলেন আর এক মা। গভীরে ভাবলে, মায়েরই সন্তানই মা। কারণ মা থেকেই মা আসেন। মা একটি জীয়ন্ত, শাশ্বত কিংবদন্তি, যাঁর আধার স্নেহ ও শক্তি।

আমাদের তত্ত্ব ও আলোচনার প্রসঙ্গে, আমরা যেগুলিকে মিথ বা কিংবদন্তি ভাবি, সেগুলি আদতে গভীর ব্যঞ্জনাময় দ্যোতক।

আমরা কলেজে পড়া কালে রাডইয়ার্ড কিপলিং নামে ব্রিটিশ নাট্যকারের উক্তি পড়েছিলাম, 'ভগবান সর্বত্র উপস্থিত থাকতে পারেন না। তাই তিনি মা-কে তৈরি করেন।' আমাদের এই মা বনদুর্গার উৎপত্তি ও তত্ত্বকথা অনেকটা ওরকমই। মা নিজে উপস্থিত হতে পারলেন না, তাই তার কন্যাকে আমাদের মাঝে রক্ষায়ত্রী 'মা' করে রেখে গেলেন।"

***

এইবেলা আমাদের বৃদ্ধ বাবাঠাকুরের পরিচয়টি দিয়ে রাখা প্রয়োজন বোধ করছি। আমাদের দাদা-জ্যাঠাদের কাছে শুনেছি, বাবাঠাকুর আমাদের গ্রামের সর্বপ্রথম আই.এ. পাশ দেওয়া ব্যক্তি। সে-সময় কলকাতার একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিও পেয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই তাঁকে বাঁধতে পারেনি। তিনি তখন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত।

বাবাঠাকুর জমিদারগৃহের সন্তান। আভিজাত্য ছিল। সেইসঙ্গে কৈশোর থেকে ছিল বক্তৃতা রাখার সহজাত দক্ষতা। অনুশীলন সমিতি তাঁর এই গুণকে কদর করেছিল। অবিভক্ত বাংলার পথে-প্রান্তরে অগ্নিমন্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ গোঠ বিশ্বাস। সাজা, কালাপানি হয়েছিল। ফিরে এসেছিলেন ষাটের দশকের শেষে। আমরা তখন কলেজে পড়ি। তবে মানুষটা আর তখন ভূপেন বিশ্বাস নন, পুরোদস্তুর এক সাধক।

সম্পত্তি দূর অস্তু, পূর্বাশ্রমে নিজের ভাইপো-ভাইঝিদের কাছেও থাকেননি। মাঠ-পুকুরে সর্প-উপদ্রুত থানে নিজের চালামন্দির গড়ে রয়ে গিয়েছিলেন। শাঁখ, কাঁসর, ঘণ্টা বাজিয়ে মহাসমারোহে মায়ের আরতি করতেন প্রতি শনিবার। আমরা শনি-সন্ধ্যায় তাঁর সন্ধ্যারতি দেখতে যেতুম। তিনি প্রসাদী গুড়, বাতাসা আর পাঠ দিতেন, অর্থাৎ আমাদের চক্ষু খুলতেন। আজও তেমনই এক দিন, অপ্রচলিত মাতৃপূজার পাঠ।

***

বাবাঠাকুর বলে চললেন, "দেখো, মা-কে আমাদের মননের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে তো হবে না। তাঁর পূজা-পাঠ, রীতিনীতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। অ'সো, মা বনদুর্গার পূজারীতি সম্বন্ধে আমি তোমাদের খানিকটা ধারণা দিই।

মায়ের পূজার আদি কথা যেটা ধরা হয়— একসময় আদিদেব পঞ্চমুখে দুর্গামাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন এবং তাঁর সম্মুখে বসে গণেশঠাকুর তাঁর চারিহস্তে সেই মাতৃস্তুতি লিপিবদ্ধ করছেন। এখন পঞ্চমুখে পাঁচটি মাহাত্ম্যকথা আর তাঁর চারটি হস্ত; স্বাভাবিকভাবেই একটি বর্ণনা বাদ চলে যায়।

বিষয়টি গোচরে এলে মা বলেন, সমস্যা নেই। মর্ত্যে মা হয়ে অবস্থান করছেন তাঁরই কন্যা। তিনিই মর্ত্যের দুর্গা। তিনিই মাতৃকা-মাহাত্ম্য আপনার কর্মের মধ্যে দিয়ে সমাপন করবেন এবং মাতৃকা-মাহাত্ম্য চরাচরে ছড়িয়ে দেবেন। সেই হতেই মর্তের অরণ্য হতে সমাজ কিংবা গৃহ— সর্বত্র মা দুর্গা লৌকিক দুর্গা বা বনদুর্গা রূপে অধিষ্ঠান করছেন।"

"দুর্গানাম স্মরণ করলেই আসে এই স্তোত্রটি—

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজ্জনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে।।
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে।।

অর্থাৎ, সমগ্র জগৎই আশ্বিনে মা দুর্গার পূজা করে। তিনি কল্যাণী, অন্নপূর্ণা তথাপি তিনি উৎসর্গে তুষ্ট। সেই উৎসর্গের আমিষ, নিরামিষ হয় না। তা প্রসাদ। মায়ের অঞ্চলে বর্ণ নেই, ভেদ নেই। থাকে না।

এই স্মরণে সর্বাধিক যিনি মনে পড়েন, তিনি বনদুর্গা রূপ। মায়ের রূপটি হল— চতুর্ভুজা ব্যাঘ্রাসীনা ব্যাঘ্রাম্বর-পরিহিতা নীল জীমূত সঙ্কাশা।

অর্থাৎ, ব্যাঘ্রাসীনা চতুর্ভুজা বরাভয়দায়িনী দেবী। এই দেবী কখনও পার্বতী-দুর্গার সঙ্গে মিলিয়ে সিংহারূঢ়া। কিন্তু দেশান্তরে ভ্রমণকালে দেখেছি, অনেক স্থলেই তিনি সাক্ষাৎ মা বনদেবী। মায়ের বেশবাস, শৃঙ্গার অরণ্য-কন্যাসদৃশ। কেউ আবার বনদুর্গাকে বনদেবী বলে মনে করেন। আদিমকালে দেশ আর অরণ্য সমার্থক ছিল। অরণ্যাচারী মানুষের খাদ্য হতে পোশাক, যাপন সর্বতোরূপে অরণ্যনির্ভর ছিল। সেই অরণ্য বা সেই প্রকৃতিকেই তাঁরা দেবী মানতেন। অথবা নারী হতে সৃজন হয়; তাই অধিষ্ঠাত্রী দেবীই বনদেবী; উত্তরকালে হয়তো বনদুর্গায় রূপান্তরিত হয়েছেন।

'ময়মনসিংহ গীতিকা'-য় কমলার বারোমাসিতে বলছে, মা বনদুর্গার পূজার সময় প্রাতঃকাল। অর্থাৎ, মনোরম, শান্ত সময়ে মায়ের পূজা, তাই মায়ের মূর্তি স্নিগ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

তবে ব্যতিক্রমও দেখেছি ভাইয়েরা, যেমন এই শ্লোকটি—

দেবীং দানব মাতরং নিজ মদা ঘূর্ণন্মহালোচনাং
দংষ্ট্রা ভীমমুখীং জটালি বিল সম্মৌলিং কপালস্রজম।
বন্দে লোকভয়ীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্র হারোজ্জ্বলাং
সর্পাবদ্ধ-নিতম্ববিশ্ব বিপুলাং বানান, ধনবিভ্রতীম।।

মাতা মহালোচনার সদা ঘূর্ণ্যমান অক্ষিগোলক অর্থাৎ সদাই সজাগ দৃষ্টি। তিনি করালদ্রংষ্ট্রা, ভীমমুখী, ভীষণ। মায়ের গলে সর্পহার, জটাভাল, পদভারে অবনত সমস্ত বিশ্ব।

এখানে মা ভয়ংকর, শাসন ও বারণ মূর্তি তবে এই পূজা কয়েকটি নির্দিষ্ট গৃহে স্বপ্নাদেশ বিনা হয় না।"

: পূজাপদ্ধতি :

"সাধারণ গৃহী ব্রত/বারণ ব্রত: মায়ের পূজাপদ্ধতি অত্যন্ত সাধারণ। সাধারণ গৃহী মানুষ ব্রত করেন তাঁর ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং নিবেদন দিয়ে। এই ব্রত একেবারেই সমর্পণনির্ভর। যেমন ধরো, শীতের শেষে ঘরে নতুন ডাল উঠেছে, তাহলে মায়ের ভোগে খেসারি-কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভোগ; কিংবা ধরো, পুকুরে মস্ত একখানা রুই উঠেছে, রুইয়ের মুড়োটি দিয়ে মায়ের ভোগ হল। আদ্যোপান্ত ঘরের গৃহকর্ত্রীটিই তিনি।

সচরাচর শনি-মঙ্গলবারে কোনো শ্যাওড়া বা পাকুড় গাছের তলে মায়ের থান বা পাটে তাঁর পূজা হয়। যে স্থানে কোনো

গাছ নেই, সেখানে উক্ত গাছের ডাল পুঁতে মায়ের পূজা করা যেতে পারে।

ঢাকার ধামরাই, রঘুনাথপুর, নবাবগঞ্জ কিংবা ময়মনসিংহ, শ্রীহট্টের যে পরগনাগুলিতে মায়ের পূজাপাঠ হয়, তাদের রীতি হল, যে-কোনো শুভ অনুষ্ঠান, তা সে অন্নপ্রাশন হোক, বিবাহ হোক বা জাতকর্ম হোক, মায়ের পূজা দিতে হবে সর্বাগ্রে। কারণ বনদুর্গাই হলেন শস্যপ্রদায়িনী, শিশুরক্ষক, গোসম্পদ-রক্ষক, মঙ্গলদায়িকা।

আর এই প্রসাদ করার একটি নিয়ম আছে। সেটা হল—কলার ডগার পাতা অর্থাৎ নরম 'মুচি' বলা হয় যে পাতাকে, সেই পাতার আগা কেটে তার মধ্যে ভোগ সাজানো হয়। এই সাজানোটিকে বলা হয় 'ঠাঁইৎ'।

এই ভোগ মা-কে নিবেদন করা হয়। কথিত আছে, মা কাকরূপ ধরে আসেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন।

উপস্থিত থেকে দেখেছি, অদ্ভুতভাবেই সেই প্রসাদে কাক এসে ঠোক্কর মেরে যায়। যদি কাক এসে প্রসাদ না ছুঁয়ে যায় তাহলে ধরা হয় কোনো ত্রুটি হয়েছে।

আমাদের অরন্ধন পূজার মতোই গলায় কাপড় দিয়ে, মায়ের পাটের সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত প্রক্রিয়া করতে হয়। মায়ের কাছে আকুল হয়ে কেঁদে পড়ে ক্ষমাযাচনা করে আবার ভোগ রন্ধন ও নিবেদন করতে হয়। দাঁড়াও," বলে বাবাঠাকুর একখানি শালুমোড়া খাতা বার করলেন। শালুর মোড় খুলে জীর্ণ খাতা থেকে শুরু করলেন পদ্য পড়া।

"এতক্ষণ আমরা জানছিলাম মায়ের গৃহী ব্রত, কিন্তু বনদুর্গা মায়ের আর একটি রাজ ব্রতও বর্তমান।

: গাছের গোড়ার ব্রত :

"বিবাহ, সীমন্তোন্নয়ন, জাতক-শৌচান্ত, অন্নারম্ভ প্রভৃতি শুভকার্য উপলক্ষ্যে সন্তানের মঙ্গলকামনায় ময়মনসিংহের বহু স্থানে বহু হিন্দু পরিবারে বিশেষ আয়োজন-উদ্যোগ করে 'গাছের গোড়ার ব্রত' করা হয়।

মূলত মানসিক বা মানত ব্রত, 'হে মা, আমার/ অমুকের যদি সন্তান হয় তাহলে এই এই উপকরণে, মায়ের পূজা করিব।'

মানত অনুযায়ী মা বনদুর্গাকে বুক চিরে রক্ত দেন কেউ। বুক চিরে বলতে ভয় পেয়ো না। খড়্গ ছোঁয়ানো মাত্র; অথবা সাধারণত নাপিত তার নরুন স্পর্শ করে রক্ত বার করে। তারপর পান, শ্যাওড়াপাতা অথবা বটপাতায় করে তা দেবীর উদ্দেশে দেওয়া হয়।

এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, দেবী রক্তপিয়াসী। বরং, এর অর্থ হল, নিজের রক্তটিকে দেবীচরণে উৎসর্গ করলাম, তাকে তুমি রক্ষা কোরো। এই রক্ত হল সন্তানের প্রতিরূপ।

অবস্থাপন্ন পরিবারে সন্তানের সমান ওজনে চিনি-বাতাসা, মঠ, কদমা নিবেদন করেন। তারপর সন্তানের কুশলার্থে শাড়ি গাছে জড়িয়ে ব্রতগীত আলাপ করেন। ব্রতান্তে এই শাড়ি ভুঁইমালি বা পুরোহিতে নেন।

নিয়ম : উক্ত গাছগুলির গোড়ায় কলার পাঁচটি (বিজোড়) আগপাতায় আতপের চিঁড়া, চাটখই গুঁড়া, ঝিকর, আইট্যা কলা, ফুল, দূর্বা, চিনি-বাতাসা প্রভৃতির নৈবেদ্য দেওয়া হয়।

মা বনদুর্গা ওই গাছের মধ্যে অধিষ্ঠিতা আছেন— এই বিশ্বাসে ব্রতিনী গাছের শাখেই শাঁখা-সিঁদুর, আয়না-চিরুনি,

লাল হলুদ সুতো, কাপড়ের গিট্টি, আইট্যা কলা, পান-সুপারি ও মুঠমাখা চিড়া-গুঁড়া সাজিয়ে দেন।

একটি আগপাতায় পিটুলিগোলার দুটি মূর্তি ও কালো মাটির গোলাকার চুড়ি দেওয়া হয়। মূর্তিদুটির প্রচলিত নাম 'শাঁখা-পলা' এবং চুড়িদুটির নাম 'কাচ'।

হ্যাঁ, শাঁখা-পলাকে এখানে ওতপ্রোত সহচরীজ্ঞানে পূজা করা হয়।

ময়মনসিংহের কিছু স্থানে কলা খোলের ডোঙায় করে ধান, চাল, হাঁসের ডিম দেওয়ার রীতি আছে। ছাগ-মহিষাদি বলিও হয়।

ব্রতের শেষে ব্রতিনী 'সই-সই' বলে সেই গাছের সঙ্গেই সাতবার কোলাকুলি করেন।

এরপর সই পাতানো হয়। দুই ভাগে দেওয়া নৈবেদ্যের এক ভাগ ব্রতিনী নিজের দিকে টানেন, আর এক ভাগ গাছের দিকে ঠেলে দেন, আবার উলটোটা। অর্থাৎ পারস্পরিক আদান-প্রদানের দ্বারা সখ্য স্থাপন হয়।

সাতবার এইরূপ করবার পর ব্রতিনী একভাগ নৈবেদ্য আর দেবীর সখ্য নিয়ে ঘরে ফেরেন। সন্তানের মাথায় ছোঁয়ান।

: মায়ের গীত :

: প্রারম্ভ গীতিকা :

কই গেলা মালী ছেড়া-এর' আইস চাই
পন্থখানি চাইছা দেও সইয়ের বাড়ি যাই।
কই গেলা গো মালী ছেড়ি, এর' আইস চাই
পন্থখানি ছিটাইয়া দেও সইয়ের বাড়ি যাই।
কই গেলা গো প্রাণের ননদী এর' আইস চাই।

গয়নাখানি পরাইয়া দেও সইয়ের বাড়ি যাই।
কই গেলা গো প্রাণের দেওরিয়া এর' আইস চাই,
সোয়ারিখানি আইনা দেও সইয়ের বাড়ি যাই।
কই গেলা গো গুণের শাশুড়ি এর' আইস চাই।
শঙ্খ-সিন্দুরে সাজাইয়া দেও সইয়ের বাড়ি যাই।

এই ব্রতের কথা, দাদুরা, ব্যবহারিক জীবনে লুকিয়ে আছে। যিনি ব্রত করছেন, তাঁর কার্যকরণ ও পন্থাই ছন্দে মায়ের গীত তৈয়ার করছে।

যেমন এখানে, ব্রতিনী ব্রতের সাজি নিয়ে শ্যাওড়া বা বটতলে যাচ্ছেন। বর্ষার পথ-প্রান্তর। দূর্বা, আগাছা, কর্দমে পথ রুদ্ধ। ব্রতিনী স্নান সেরে শুদ্ধগাত্রে চলেছেন পূজা দিতে। এখন পা নোংরা হলে তিনি কীভাবে পূজা দেন? সে বট বা পাকুড়ের তলে তো কোনো পুষ্করিণী নেই। তিনি পুনরায় হাত-পা ধোবেন কী উপায়ে? সেখান হতেই এ পদ্য বা পঙক্তির অবতারণা।

সেকালে মালি (ভুঁইমালী) সম্প্রদায়ের জীবিকা ছিল রাস্তাঘাট, উঠান-আঙিনা মার্জনা করা। এই সকল কাজের জন্য তারা লৌকিক দুর্গা মা ও অন্যান্য দেবতাদের দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তি পেত এবং পুরুষানুক্রমে তা ভোগদখল করত।

এই গান সেই কথাই বলছে। তিনি মালির মেয়েকে পথ পরিষ্কার করে গোবরজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করতে বলছেন— 'কই গেলা গো মালী ছেড়া, এর' আইস চাই।'

ব্রতিনী পরমসখী অর্থাৎ আরাধ্যা মা বনদুর্গার বাড়ি যাবেন; এরপর একটু সাজাগোজা প্রয়োজন। তাই প্রাণপ্রিয় ননদের ডাক পড়ে। দেবর আনবে চতুর্দোলা আর শাশুড়ি হলেন গৃহকর্ত্রী। এই ব্রতের খুঁটিনাটি তাঁর অপেক্ষা ভালো কেউ জানে না, তাই তিনিই পূজা শঙ্খ-সিঁদুরে সাজিয়ে দেবেন।

আমাদের আসল শক্তি কী জানো, দাদারা? ভালোবাসা। এই যে দেবদেবীরা— মা দুর্গা, মা মনসা কিংবা এই লৌকিক দেবদেবী— সবাইকেই আমাদের স্বজন-বান্ধব রূপে আমরা আমাদের খুব কাছাকাছি ভেবে নিই। ভয় অপেক্ষা ভক্তি, ভালোবাসা, সমর্পণকে প্রতিষ্ঠা দিই।

তোমরা বড়ো হবে। অনেক কিছুই জানবে, বুঝবে। যুক্তির কষ্টিপাথরে অনেক কিছুই বিচার করবে। ঈশ্বর ও ধর্মের প্রকৃত সংজ্ঞা বোধগম্য হবে। তখন দেখবে কন্যাভাবে, বন্ধুভাবে, পরমাত্মীয়ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করা সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। অথচ কীভাবে সেই স্তরের অনুধাবন করেছেন আমাদের মা-ঠাকুমারা, যারা কিনা পুথিজ্ঞানী নন! আর এখানেই লৌকিকতার ভিত্তি। এই কারণেই তো বাংলায় এত লৌকিক দেবদেবী, কারণ তাঁরা ঈশ্বরের আগে তাঁরা মানুষ!"

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। মনে হল নরেশ্বরের কথাটির বোধটিতে সিলমোহর দিলেন স্বয়ং নরেশ্বর।

বাবাঠাকুর খানিক থেমে আবার পাতা ওলটানো শুরু করলেন, "মায়ের একাত্মতার আর একটি উদাহরণ দিই।

: আলাপ গীতিকা :

কাটারিয়ে কাটিয়া, বাটারে ভরিয়া
রাজসভা দেবসভা জানাইয়া আইস গিয়া
দেবী যাইবাইন সইয়ালায় গো, কে কে যাইবা সঙ্গে
সই আইস বইস।
দোলা যে পাঠাইছিলাম সই তাতে না আইলা কেন,
ইচ্ছামতী ধলাই গাং কেমনে হইলা পার।
সই আইস বইস।

নাকের বেশর সই খেওয়ানিরে দিয়া
এমনে হইলাম পার।
সই আইস বইস।
পিন্ধনের শাড়ি গো সই খেওয়ানিরে দিয়া
এমনে হইলাম পার।
সই আইস বইস
হস্তের শঙ্খ গো সই খেওয়ানিরে দিয়া
এমনে হইলাম পার।
সই আইস বইস।

মা বনদুর্গা ব্রতিনীর সঙ্গে সখ্য করতে যাবেন। তিনি তাঁর পারিষদ-বন্ধু সবাইকে বার্তা দিচ্ছেন যে, তোমরা আমার সঙ্গে চলো। আমার সঙ্গী হও। নিমন্ত্রণ, শুভবার্তা প্রেরণকালে বাটাভরা পান-সুপারি দিতে হয়। দেবীর কাছে ভক্তমানবের সঙ্গে সখ্য-সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রেও বাটাভরা পান-সুপারি পাঠাচ্ছেন। অর্থাৎ তিনিও উদ্‌গ্রীব এই সাক্ষাৎহেতু...

দেবী ও ব্রতিনীর সহিত শ্যাওড়াতলে মিলিত হয়ে নিজের মতো সুখ-দুঃখের গল্প করছেন— 'কত দিন পরে দেখা', 'সখী, এসো এসো, বসো', 'পায়ে হেঁটে এলে! আহা, কত কষ্ট হল', 'এই খরস্রোতা ইচ্ছামতী ও ধলেশ্বর নদী তুমি কীরূপে পার হলে?

মা বনদুর্গা বলছেন, 'সন্তানসম সখীর প্রাণের টানের কাছে সবই তুচ্ছ। তিনি নাকের বেশর, হাতের শঙ্খ পারানি হিসাবে দিয়েছেন। কিন্তু খেয়ানির তুষ্টি নেই। তাই পরিধানের শাড়িটি পর্যন্ত তাহার হাতে তুলে দিয়েছেন।'

ভাবো দেখি, এমন আপন করে দেবীকে কে ভাবে! এইজন্যই তো এঁরা লৌকিক দেবী, কারণ এঁদের মাহাত্ম্যকে লৌকিকতার পেলবতা বিশ্বাসযোগ্য করেছে।

অনেক সময় গাছ গোড়ার ব্রত পালনের পূর্বে গাছকে নাড়া দিয়ে জাগাতে হয়। সেই আবাহন গীতিটিও শোনো, কী অসম্ভব প্রাণবন্ত।

: গাছ জাগাইবার গীত :

আগেত' ঝাপরা শেওড়া গুঁড়িতে মুরলী
ঘুমের ঘুমুলী শেওড়া কে তোরে জাগাইল?
— খই চিড়ার বাসে গো আপনে জাগিলাম।
আগেত' ঝাপরা শেওড়া গুঁড়িতে মুরলী
ঘুমের ঘুমুলী শেওড়া কে তোরে জাগাইল?
— ভোগ নৈবেদ্যের বাসে গো আপনে জাগিলাম।
আগেত'....জাগাইল?

এই গীতে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে— 'কে তোমাকে জাগাল হে, সই বৃক্ষ?' শেওড়া উত্তর দিচ্ছে, 'আমাকে আর কে জাগাবে! খই, চিঁড়া, গুঁড়া, নৈবেদ্য এই সকলের সুঘ্রাণেই আমি আপনা হতে জেগেছি!'

সব উৎসব, লৌকিক বারব্রতের মধ্যে বহতা সংস্কৃতির ইঙ্গিত থাকে। তার নিদর্শ এই অন্তিম গীতিকা—

আজি কী আনন্দ সই গো মধুপুর যাইতে
শাড়ি বদল করুইন তানা দুই সইয়ে
আজি কী আনন্দ সই গো মধুপুর যাইতে
শঙ্খ বল করুইন তানা দুই সইয়ে।
আজি কী আনন্দ সই গো মধুপুর যাইতে
সিন্দুর বদল করুইন তানা দুই সইয়ে
আজি কী আনন্দ...

'সই পাতানো'র (সখিত্ব স্থাপনের) কালে এক সইয়ের অন্য সইয়ের সঙ্গে বসন-ভূষণ, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি অদল-বদলের প্রথা আছে। এই দিয়েই সখিত্ব চিরদিনের জন্য পাকা হয়। এক সইয়ের মৃত্যুতে অন্য সইয়ের ত্রি-রাত্র অশৌচ ধারণ করার বিধি আছে (যেহেতু ভিন্নগোত্র অশৌচ)।"

চ্যাড়ার ফাঁক গলে চৌকো রোদ এসে পড়েছিল অনেকক্ষণ। বাবাঠাকুরের ব্রতকথায় মজে ছিলুম আমরা। এক্ষণে সাড় ফিরল।

শুধোলাম, "আমাদের আটচালার মা বনবিবিও ব্যাঘ্রবাহনা। তাহলে কি মা-ও... "

বাবাঠাকুর কইলেন, "এ-দেশের মানুষ বনদুর্গা জানে না, ভাই। মা বনবিবির কাহিনি জানতে হলে এদেশের মাটির লড়াই জানতে হবে, রায়বাবা জানতে হবে। সে এক অন্য কাহিনি। সে-কাহিনি স্বতন্ত্র। এ-কাহিনির মতো পৌরাণিক যোগ নেই। কিছু স্থলে ব্যাঘ্রারূঢ়া, আলুলায়িত শ্বেত কেশভার, চতুর্ভুজা, শস্ত্রহস্ত বারণমূর্তি আছে। তিনি মা বনদুর্গার বুড়িকালী রূপ। কিন্তু কখনোই মা বনবিবি নন।"

।। অভয়া মা ।।

"বাড়ি থাকলে সন্ধেবেলা একচ্ছত্র করে লেখা আমার বরাবরের অভ্যাস ছিল। সেরকমই লিখতে বসে কখন যে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক আর দূরাগত শিয়ালের স্বর শুনতে-শুনতে লেখায় ডুবে গেছি নিজেরও খেয়াল নেই। চমক ভাঙল ঝন-ঝন শব্দে আমার নতুন কেনা কাচের দোয়াতটা ভেঙে যেতে...

বোঝার আগেই পিঠের চামড়া জ্বলিয়ে বাবার ছিপখানা আর একবার সপাটে আছড়ে বলল আমার বইখাতার তাকে।

আমি তখন প্রায় হতভম্ব। হাউমাউ করে ছুটে এলেন পিসিমা। আমাকে জড়িয়ে ধরে ভীষণ কান্না... আমি বুঝছিই না, এলোপাথাড়ি ছিপ চালিয়ে যাচ্ছেন। পাকা কঞ্চির পালিশ করা মসৃণ ছিপ সপাং-সপাং শব্দ করে আমাদের দু'জনকে জরিপ করে চলেছে।

মিনিট দশেক তাণ্ডব চালিয়ে বাবামশাই শান্ত হলেন। আমার বেশ কয়েক জায়গা ছড়ে গিয়েছিল। পিসিমাকে আস্তে-আস্তে বসিয়ে জল খাইয়ে শান্ত করে আসল জিনিসটা জানতে পেরেছিলাম। আমার খোঁজে পুলিশ এসেছিল।

বাবার হাতযশের কারণে অন্দরমহল অবধি আসেনি, কিন্তু সাবধান করে গেছে।"

***

"সে-রাতে সবাই শুয়ে পড়ার পর নিঃশব্দে বাবামশাই এসেছিলেন। আমার মশারিটা তুলে পাশে বসে, গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে কথাটি ব্যক্ত করেছিলেন।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বৈপ্লবিক কার্যকলাপের অনুসন্ধানে আমার নাম উঠে এসেছে। আপাতত আমার ওপর নজরদারির শমন এসেছে।

মেহার থানার মেজোদারোগা, আমাদের পাশের গ্রামেরই মানুষ; মেয়ের বিয়ের সময় বাবার থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ নিয়েছিলেন। তাই নিজে এসে ঘটনাটি বাবাকে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। নজরদারিতে এতটুকু আভাস পেলেই এ-বাড়িতে খানাতল্লাশি পড়বে। এ-বাড়ির দরদালান, ঠাকুরঘর নষ্ট করবে, মেয়েরা অপমানিত হবে...

হু-হু করে কেঁদে পড়লেন রাশভারী মানুষটা।

মন ভালো ছিল না বলে দক্ষিণে জানলাটা খুলে রেখেছিলাম। আশ্বিন শেষের হাওয়া ঢুকে টেমিটাকে দপদপ করে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। দেয়ালে দুজনের লম্বা ছায়া। বাবার ছায়ার ভেতর আমি!

মনে হচ্ছিল, বহু... বহু শতাব্দের প্রাচীন এক ছবির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আমি দেবব্রত ভীষ্ম আর সামনের এই নুয়ে পড়া মানুষটা একজন পিতা— পিতা শান্তনু। বাইরে দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী, কিন্তু ভেতরে একজন অসহায় পিতা।

ওই যে বললাম, নিজেকে সেদিন দেবব্রত ভীষ্ম বলে মনে হচ্ছিল। বাবার কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'আমাকে ত্যাজ্য করে দাও। এবং মৌখিক নয়, আইনত করবে। কালই আমি বাড়ি ছেড়ে যাব। রীতিমতো অশান্তি করে ছেড়ে যাব। সবাই সেটাই জানবে।'

আজকের রাতের এই বার্তালাপটুকু বাপ-ছেলের নিজস্ব হয়েই থাক। ত্যাজ্যপুত্র হলে আমাকে নিয়ে অন্ততপক্ষে এই

বাড়িতে আর গোরাদের হাঙ্গামা হবে না। যে মানুষটার চোখের দিকে কোনোদিন তাকাতে পারিনি, সেই মানুষটা আমাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদেছিলেন।"

কথা বলতে বলতে কখন যে দাদুর চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়েছিল বুঝতেই পারিনি।

দু'ঢোঁক জল খেয়ে আবার বললেন বাবাঠাকুর, "কালীসাধনার সব থেকে বড়ো কথা কী, জানো? কালী হচ্ছেন মা। ফলে সংসার ভোলা যায় না। মহামায়ার মায়া, এই সংসারের মায়াতেই তিনি বাস করেন। নাহলে এত বছর পর আমার মতো সাধকের চোখে জল আসে!"

আজ আমরা মানে, আমি, আমার বড়দা, আমাদের ছোটো তিন ভাই-বোন, গ্রামের কাশেম, জগা, ফুল্লরা— সবাই বাবাঠাকুরের চালায় এসে বসেছি। বাবাঠাকুরের চালায় মাতৃকথন-ব্রতকথার পাঠটির চন্দনসৌরভ আমাদের বারে-বারে আকর্ষণ করত। বলা নেই, কওয়া নেই চলে আসতাম। বাবাঠাকুর জপতপ করলে বাইরে চুপচাপ বসে থাকতাম, কিন্তু গল্প শোনার মোহে থেকে যেতাম।

আমরা বাবাঠাকুরকে আস্তে-আস্তে 'দাদু'/'দাদা' সম্বোধন করা শুরু করেছিলাম। শীতের কাঁথার মতো জড়িয়ে নিয়েছিলেন বাবাঠাকুর।

"যা-ই হোক, ও-সব কথা থাক, বাড়ি থেকে বেরনোর পর আমার সংগঠনের কাজ দৃঢ় হল। এরপর থেকে আমি পর্যটকের মতো কেবল ঘুরে ফিরেছি; পথের পর পথ, মাঠের পর মাঠ শুধু বেপরোয়া এলোমেলো হেঁটে গিয়েছি। সাহেবের পুলিশ সরাসরি আমার সামনে আসত না, কিন্তু আমি বুঝতাম আমাকে অনুসরণ করা হয়। আমাদের চব্বিশ পরগনা থেকে বেরিয়ে প্রথম আমি যেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম, সেটা অপর পাড়!

গঙ্গার পাড় ধরে, জলপথে গিয়ে সোজা সেই শিবপুরীতে গিয়ে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম। সে-সময় কলকাতাকে ব্রাত্য করা হয়েছিল।

একা-একা ভাগীরথীর পাড়টিতে বসে থাকি। তরুণী বধূর মতো উচ্ছল বেগে বয়ে চলেছে ভাগীরথী। সমতল হলেও স্রোত এখানে শ্লথ নয়, মাঝারি। আর তাই জনপদের আশীর্বাদও গড়ে উঠছে দ্রুত। আর প্রতিটি জনপদের কেন্দ্রে গড়ে উঠছে একটি-একটি করে শিবমন্দির। তাই ভাগীরথীর পশ্চিম তীর 'শিবপুরী' নামেই আখ্যায়িত হয়েছিল।

মাড় দিয়ে পরা বাসি ধুতির মতো দুমড়ে আছে মন। দুর্গাপূজার মহার্ঘ্য সময়খানি এগিয়ে আসে... বাড়িতে থাকলে কতই না আমোদ-উচ্ছ্বাস! আর এখানে আমি একা বুক ভরা বিষাদ নিয়ে বসে থাকি। তবে বেশিদিন সে বিষাদ রইল না, বিপিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও কাজ আমার সকল বিষাদ ঘুচিয়ে দিয়েছিল।

শিবপুরী-ই পরে হয়েছিল শিবপুর। শিবপুরের শিকড়টি অতি প্রাচীন হওয়ায় স্থানীয় অনেক জমিদারই গোপনে বিপ্লবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেখানে আমার সভা-সমিতির কাজ ভালোমতোই চালু করা গেল।

রায়চৌধুরীবাড়ির বিপিনকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সমিতির নির্দেশে। বিপিনের কাজ ছিল ছদ্মবেশ করানো। শুনেছিলাম, বিপিনদের বাড়ির পূজা এই অঞ্চলের সর্বাধিক প্রাচীন দুর্গাপূজা। স্বয়ং মা পূর্বপুরুষের স্বপ্নে এসে পূজার আদেশ দিয়েছিলেন।

ওদের বাড়িতে প্রতি বছর পূজায় পালা মঞ্চস্থ হত। সেই সুবাদেই বিপিন ছদ্মবেশ তৈরি করা শিখেছিল। এই বিপিন আমার দুর্গাপূজা ব্যর্থ হতে দিল না। তার সঙ্গেই বনবন করে ঘুরতে-ঘুরতে মনখারাপ বাষ্পের মতো উবে গেল।

শিবপুর শিবপুরীই বটে। শুনলাম, দক্ষিণবঙ্গের গুটিকয় শারদোৎসবের মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ অঞ্চলের প্রাচীন দুর্গাপূজাটি এখানেই সম্পন্ন হয়েছিল (১০৯২ বঙ্গাব্দ)। এখানে দুইজন ভগিনী মা রয়েছেন। কাহিনি বড়ো বিস্ময়কর..."

: সাঁজার আটচালা :

"চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর মণিগ্রামের ভরদ্বাজবংশীয় ব্রাহ্মণ রামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায়— ইনিই আমাদের বিপিনের পূর্বপুরুষ, মাতুলকুলের এগারোখানা ডিহির ভাগ পেলেন— শিবপুর, ব্যাতড়, ব্যাতাইতলা, নিবড়া, সলপ, ডাসি, নিতাঙ্কুর, চামরাইল, মাঝেরহাট, দেবীপাড়া, বাঁকড়া।

সপরিবারে তিনি এখানে এসে নিজের নতুন জমিদারি পত্তন করলেন। মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ হলেন রায়চৌধুরী। শিবপুর তখন গ্রাম, আদি ভূখণ্ডটি হল বেতড় বা ব্যাতাইতলা।

সময় যায়। নতুন বসতবাটির সঙ্গে শিবমন্দির নির্মাণ করে পূজা-অর্চনায় মেতে থাকেন রামব্রহ্ম রায়চৌধুরী। নতুন পত্তনি, তাই নিরুপদ্রব জীবন। প্রজাপালন ও পূজা-অর্চনা— এইটুকুই ছিল সেই সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের কর্ম।

তিনি সন্ধ্যাহ্নিক কালে দেখতেন, তাঁর শিশুকন্যা মন্দিরসংলগ্ন পুষ্করিণীর ঘাটে, ফুলের বাগিচায় খেলে বেড়াচ্ছে। রোজই শোনেন, তার সইয়ের সঙ্গে উচ্চ আলাপ, হাসিরঙ্গ করছে। অথচ সেই সই মেয়েকে তিনি একদিনও দেখেননি!

কৌতূহলী হয়ে রামব্রহ্ম একদিন মেয়ের পিছে-পিছে ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। মেয়ে আপন খেয়ালে খেলে চলেছে, কথা বলে চলেছে। কিন্তু উলটোদিকে তো কেউ নেই! ভাবলেন, আশেপাশের ঝোপেঝাড়ে আছে হয়তো, তাঁকে দেখে লুকিয়ে

পড়েছে। তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু মেয়ের সঙ্গীকে পেলেন না। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা রে, তোর বন্ধুর নাম কী?'

মেয়ে উত্তর করলে, 'পদ্মা।'

সত্যিই তা-ই। পুকুরপাড়ে তাঁর মেয়ের পায়ের চিহ্ন ছাড়া আর একটি ছাপ বর্তমান। পদ্মার ছোটো-ছোটো, আলতামাখা পায়ের ছাপ। মেয়ের নিঁখুত বর্ণনা সবই প্রমাণ দিচ্ছে পদ্মা আছে...

সেই শিশু কি তবে তাঁর সঙ্গে মশকরা করছে? এইটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় লুকোবে? তবে কি গ্রামে পালিয়ে গেছে!

গ্রামে ঢ্যাঁড়া পড়ে যায়, কিন্তু সেই শিশুকন্যার খোঁজ আর পাওয়া যায় না। শেষে ভয়ানক দুশ্চিন্তাটাই এল... মেয়েটি কী তবে পুকুরে পড়ে গেছে? ডুবুরি নামানো হল, কিন্তু কিছুই ফল হল না। এদিকে তাঁর মেয়ে সমানে বলে যাচ্ছে, 'পদ্মাকে খুঁজে এনে দাও!'

চিন্তায় রামব্রহ্ম শয্যা নিলেন।

এইবার সেই শিশুকন্যা এলেন, তবে অভয়া দুর্গা রূপে, রামব্রহ্মের স্বপ্নে। আদেশ করলেন— আশ্বিনের শুক্লপক্ষেই তিনি রামব্রহ্মের দ্বারা পূজিতা হতে চান। তবেই অধিষ্ঠাত্রী হবেন তিনি।

সেদিন ছিল ভাদ্রের নবমী, হাতে সময় কম। তড়িঘড়ি নিজের সবটুকু দিয়ে রামব্রহ্ম মায়ের পূজার ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে ওই পরিবারগুলিতে আজও একইরূপ নবম্যাদি বোধন বা কল্পারম্ভ মানা হয়।"

"কল্পারম্ভ কী, দাদু?" বড়দা তাল কাটলে...

"কল্পারম্ভ হল দেবতার ঘুমানো। দেবতারা আমাদের মতো নন। তাঁদের রাজত্বে ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাত। আমাদের যখন পুজো হয় তখন তাঁদের ঘুমানোর সময়। যখন কোনো মানুষ গভীর ঘুমে থাকেন, তখন আমরা কী করি... তাঁর গায়ে

হাত দিয়ে তাকে আস্তে-আস্তে ডেকে তুলি। এ-ও তা-ই। ভাদ্রের ওই নবমীর দিন থেকে মন্ত্রতন্ত্র পাঠ করে আস্তে-আস্তে ডেকে তুলে পূজার চারটি দিনের পূজা দেওয়া হয়।

তবে, সবার একরকম কল্পারম্ভ হয় না। কল্পারম্ভ মূলত দুই প্রকার— এই নবম্যাদি কল্পারম্ভ এবং প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ।

নবম্যাদি কল্পারম্ভ মোট তেরোদিনের পূজা। যেমন বললুম, কৃষ্ণপক্ষের নবমী থেকে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী পর্যন্ত তেরোদিনের পূজা-অর্চনা।

আর প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ হল ছ'দিনের পূজা। মহালয়ার অমাবস্যার পরদিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে ষষ্ঠীর দিন।

হালে আর একটি কল্পারম্ভ বিধান অনুসৃত হয়— 'ষষ্ঠ্যাদি বোধন'। একেবারে, ষষ্ঠীর দিনেই মায়ের নিদ্রা ভাঙানো হয়।

সহ বামেন ন উষো বি উচ্ছা দুহিতর্ দিবঃ
সহ দ্যুম্নেন বৃহৎ বিভাবরী রায়াদেবী দাস্বতী।।

অর্থাৎ, হে উষা, হে মা, হে ধরিত্রী-দুহিতা মাতা, তুমি উদয় হও, প্রকাশ হও। শস্য দাও, প্রাণ দাও, আলো দাও।

এত গভীর তত্ত্ব থাক, রামব্রহ্ম মুখুটির দালানে ফিরি। পূজা তো হল, কিন্তু গোল বাঁধল নবমীতে। বিধিমতে, খোলা প্রাঙ্গণে বা মণ্ডপে তো বলিদান হবে না। এবার মায়ের নির্দেশেই, বেতড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রাচীন ব্যাতাইচণ্ডী (বেত্রচণ্ডিকা)-র মন্দির-প্রাঙ্গণেই দশমীর শ্বেতছাগ বলি সম্পন্ন হল। তারপর সাজানো হল রামব্রহ্মের নিজের আটচালা।

রাতারাতি সাজিয়ে নেওয়া আটচালা থেকে ওই প্রাঙ্গণ নাম পেল 'সাঁজার আটচালা'। তারপর তিনশত চার বছর পেরিয়েছে। দরদালান, নহবত সবই হয়েছে। কিন্তু সেই

'সাঁজার আটচালা' আজও আছে। বিপিনদের সেই জাঁকজমক, জৌলুস হয়তো আজ নেই, কিন্তু প্রাণের অভাব নেই। বিশেষ করে সরকার বাহাদুরের সঙ্গে কিঞ্চিৎ গোলযোগের দরুন অনেক বিধিনিষেধ প্রণীত হয়েছে। কিন্তু মায়ের মুখখানা সত্যিই করুণাময়ী। দেখলেই মন ভরে যেত।"

আমরা উঠে পড়তে যাচ্ছিলাম। বাবাঠাকুর থামালেন, "আরে যাও কোথায়? মায়ের কথা যখন শুনতে এসেছ, মায়ের বোনের কথাও শুনে যেতে হবে। সেখানে কেবল মা একা ছিলেন না, মায়ের বোনও এসেছিলেন মায়ের পিছু পিছু....

রামব্রহ্ম রায়চৌধুরীর অধিষ্ঠাত্রী মা পদ্মার ভগিনী হলেন সর্বস্ব পালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অভয়া!

শিবপুরের রামব্রহ্ম রায়চৌধুরীর সাঁজার আটচালা ও পদ্মামায়ের পুজোর পর মা দুর্গা তথা মা, সিংহবাহিনী অভয়া হয়ে আসেন।"

: অভয়া মা :

"পাল-রা পারিবারিক ব্যবসায় বেশ উন্নতি করেছিল। শাঁখা-সহ আরও বিবিধ পারিবারিক ব্যবসা তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন। এই বংশের প্রাণপুরুষ সর্বস্ব পাল।

সর্বস্ব পাল স্বপ্নে 'মা পদ্মা'-র দেখা পান। শ্রী একই, রূপ সিংহবাহিনী অথচ মা অসুর সংহারক নন, বরং কল্যাণী অভয়া রূপে দর্শন দেন। মাতৃ-আদেশ হয়, তিনি রামব্রহ্মের পূজিতা মা পদ্মার ভগিনী অভয়া; তাই অসুরসংহারক নয়, বরং এই অভয়া রূপেই এই বংশে পূজ্য হবেন।

সেই হতে শুরু হল পূজা। স্বপ্নাদেশ মেনে, মূর্তি এখানে দশভুজার বদলে দ্বিভুজা। মা সিংহে আসীন। সঙ্গে পুত্র ও

কন্যারা। এক হাতে অভয় এবং আর অপর হাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও ডালিম।

দিদির সম্মান রেখে মা অভয়ার পুজোয় ঢাকে কাঠি পড়ে সাঁজার আটচালায় ঢাকের বাদ্য শুরু হবার পর। নবমীর বলি হয় সাঁজার আটচালায় দিদি পদ্মার উদ্দেশে বলি এবং তোপধ্বনি হওয়ার পর।

রথযাত্রার দিন দেবীর কাঠামো পূজার পর ধীরে-ধীরে দালানেই একটু-একটু করে গড়ে ওঠে মায়ের মৃন্ময়ী রূপ। এখানেও বোধন বা কল্পারম্ভ তেরোদিনের অর্থাৎ নবম্যাদি কল্পারম্ভ। বোধন থেকে নবমী চলে চণ্ডীপাঠ। দিদি পদ্মার পিছেই চলেন বোন অভয়া।

এঁরা কিন্তু কলাবউ স্নান করাতে ঘাটে যান না। দালানেই হয় কলাবউ বা নবপত্রিকা স্নান। মা পূজাকালে অন্ন নেন না, লুচি আর বিবিধ তরি-তরকারি আর মণ্ডায় সাজানো হয় মায়ের অর্ঘ্য।

কেন জানি না ক্রমশ মায়ের প্রতি এক টান আমাকে টেনে নিয়ে চলছিল। আরও... আরও মাতৃদর্শনের ইচ্ছায় আমি কাতর হয়ে পড়ছিলাম। জীবনের প্রতি সবটুকু ইচ্ছা আমার চলে গিয়েছিল। সংগঠনের কাজটুকু করে চলছিলাম। আর বাকি সময় সাধুসংসর্গ করতে মন চাইত। শ্মশানের নিঃসীম শূন্যতা আমাকে টানত।

এভাবেই সন্ধান পেয়েছিলাম গুরুদেবের। তবে তোমরা এখন শিশু। গুরুর কথা বেশি বলব না। সে-সব বড়ো ভারী কথা। যতটুকু তোমাদের বলা যায়, বোধগম্য হয়, ততটুকুই বলি। যখন তোমরা বড়ো হবে তখন নাহয় তোমাদেরকে গুরুর কথা বলা যাবে...”

।। কাল রূপা ।।

"শিবপুর অঞ্চলে এক মস্ত শ্মশান আছে। জীবনপ্রদায়িনী নদীমাতৃকার এইটাই একটা মস্ত বৈপরীত্য! একদিকে নিজের দু'পাশে নগর গড়াচ্ছে, রোজ-রোজ প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভরে যাচ্ছে ঊষর প্রান্তর; অবার শ্মশানভূমিকেও বক্ষপটে গড়ে তুলছেন।

আসলে এই মৃত্যু ও মুক্তি বড়ো অদ্ভুত জিনিস, ভাই! যখন পরিবারের সবার সঙ্গে ছিলাম তখন হারিয়ে ফেলার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতাম। আর যখন সবকিছু ছেড়ে ফেললাম, আসক্তিই উঠে গেল। অদ্ভুত এক বৈরাগ্য এল, ভাবখানা এমন যে, যদি চলে যাই তাতে খেদ নেই, কিন্তু যদি রয়ে যাই যেন জীবনেও মুক্ত রই। আর এই সকল বৈরাগ্য গভীর হয় এই মুক্তিস্থলগুলিতে...

সে-বার অমনই একটা সভা চলছে। সভাটি গোপনই ছিল। কিন্তু কীভাবে যেন খবর গেল। সমাবেশে পুলিশ পড়ল। আমিও গা-ঢাকা দিলুম।

সেই সভা থেকে অনতিদূরে একটি কবরস্থান ছিল, সেখানে আড়াল নিলাম। তখন সন্ধ্যা পড়ে গেছে। কবরস্থানের ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে আছি। কালো আকাশ ঝুলে নেমে এসেছে মাটিতে। ঝিঁঝিঁরাও স্তব্ধ, নিঃসাড়।

এক ন্যুব্জ মানুষকে দেখলাম একটা-একটা করে দীপ জ্বেলে দিয়ে যাচ্ছেন। আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি আবার আর এক বৈরাগী। বৃদ্ধ মানুষটা গোরখোদক অর্থাৎ কবর খোদেন। সন্ধেবেলা

যত কবর আছে, সবাইকে একটা করে দীপ দিয়ে খানিকটা গল্পগাছা করে আসেন। আমার দিকে তাকিয়ে উদাসভাবে বলেছিলেন, 'বাপধন, মানুষ বড়ো একা গো! এখানে যারা শুয়ে আছে, এককালে সন্তান-সন্ততি নিয়ে হয়তো সুখের ঘর করেছে। খোঁজ নেবার তরে, খিদমতের তরে নফর, চাকর, পরিজন... কত্ত লোক। আজ দেখো, একা এক্কেবারে একা! এই আঁধারে শুয়ে আছে। তাই খানিক গল্প করি।"

শিবপুরের শ্মশানখানা আমায় বড়ো টানত। শ্মশানের ঘাটটিতে যখন বসে থাকতাম, অদ্ভুত এক বিষাদ এসে আমায় আচ্ছন্ন করত বারবার, একদিকে হাহাকার-কান্না আর অন্যদিকে এক মানুষের সমস্ত ইহজীবন ছাই হয়ে মিশে যাওয়া, অবিনশ্বরে বিলীন হয়ে যাওয়া— মুক্তি! আমি বার-বার শ্মশানের টানে ছুটে যেতাম। আমাকে শ্মশানের ওই অধিষ্ঠাত্রী বড়ো টানতেন।

ঘোর কালো রূপ, এক হাতে খড়্গ, অন্য হাতে কর্তিত মুণ্ডমালা! মুণ্ডমালা হতে টপ-টপ পড়ছে রক্তবিন্দু। ক্ষুধার্থ শৃগাল মুখব্যাদান করে সে-রক্ত দিয়ে আপন তৃষ্ণার নিবারণ করছে। আবার সেই মায়েরই অন্য হাতে বরাভয়। তিনি যেন বলে চলেছেন, 'আমি আছি, ভয় নেই। আমার কোলেই মুক্তি, আবার আমার কোল হতেই তোমার জন্ম। আমি কালের উপলব্ধি, আমিই কালী। মোহাচ্ছন্ন হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতাম সে মায়ের সম্মুখে। শ্মশানের সাঁইদার এসে আমায় ডেকে তুলতেন।"

বড়দা বলল, "দাদু, মা কালীর কথা আমরা জানব না?"

"মা কালী অনন্তরূপিনী। সমগ্র চরাচর জুড়ে তাঁর ব্যাপ্তি। শব জগৎপিতা শিব হয় তাঁর পদতলে— তাঁকে কী এতটুকুতে ধরা যায়? আমার আরাধ্যা মা কালিকাকে নিয়ে যখন আলোচনা

করব তখন সমগ্র কালীতত্ত্বই আলোচনা করব। আপাতত মায়ের কথাটুকুই থাক। সে আলোচনাই হয়তো গ্রন্থ হয়ে যাবে।"

লটকন বললে, "আচ্ছা দাদু, সেই যে তুমি শিবপুরের দু'জন মায়ের কথা বলেছিলে— মা পদ্মা এবং মা অভয়া— তাঁরা দু'জনেই তো স্বপ্নে যে রূপে দেখা দিয়েছিলেন, সেই রূপেই পটুয়াদাদারা তাঁদের গড়েছিলেন, প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মা কালী কী অমন একরূপেই দেখা দেন সব জায়গায়? কোথাও এমন কালোপানা রং আবার কোথাও মায়ের রং দেখি নীলচে, ভাসা ভাসা..."

বাবাঠাকুর কইলেন, "মা তো স্বপ্নেই দেখা দিয়েছিলেন। মায়ের এই রূপকল্পটি বড়োই অদ্ভুত। মা যে কত রূপে কত ভাবে দেখা দেন কেউ জানে না। আগে মায়ের রূপকল্পটি বলে নিই। তারপর তোমাদের মায়ের এমন অপরূপ দেখা দেওয়ার কথা বলব 'খন।"

: আগমেশ্বরী মা :

"নির্ঘুম রাত কেটেছে সাধকের। মা নির্দেশ দিয়েছেন, 'আজ প্রাতেঃ যে রূপে সে মাতৃরূপ দর্শন করবে, সেই ছায়াতেই হবে মায়ের সাকার রূপ। সাধক অস্থির হয়েছেন সারা রাত, না জানি মায়ের বরাভয়দায়িনী সেই মূর্তি কেমন হবে?

এই কালীসাধক সিদ্ধি পেয়েছিলেন। মা-কে দর্শনের সৌভাগ্যও হয়েছে। কিন্তু সে আপনার মানসচক্ষু দিয়ে; বেদ-উপনিষদের মানসরূপ কল্পনা। কিন্তু, মা-কে আবাহন করেন যন্ত্রে, এতে কী আর ছেলের মন ভরে? মা-কে যে সাকার দেখতে মন চায় সব সন্তানের। সাধক কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্যও কেঁদে পড়লেন মায়ের পায়ে— 'এ-বার সাকার রূপে দেখা দাও, মা, মূর্তি গড়ে তোমার অর্চনা করি!'"

"যন্ত্র কী, ঠাকুর?" আমি কইলুম।

"যন্ত্র? সে এক হিসাব। প্রকৃতি আর সৃষ্টির যে গণিত হয়, সেই গণিতের একটি অধ্যায়। ছবিতে আঁকা থাকে। এটুকুই জানো যে, সেই আঁকা ছবি পূজা করে দেব-দেবীদের ডাকা যায়।

তো যা বলছিলাম, ছেলের আকুল ডাকে সাড়া দিলেন মা। নির্দেশ দিলেন তেমতি। ঊষার আলো ফুটতেই মা ডাকে বিভোর হয়ে কৃষ্ণানন্দ গঙ্গার ঘাটে ছুটলেন, আশা এই স্নানযাত্রাই হবে তাঁর মাতৃসন্দর্শন।

গ্রামের সীমানায় এসে দেখলেন, এক বধূ গাছের গুঁড়ি পক্ষান্তরে গৃহের দেয়ালের ওপর নিবিষ্ট মনে ঘুঁটে চাপড়া দিচ্ছেন। বাম হাতে গোবরের মস্ত তাল আর ডান হাত উঁচুতে তুলে ঘুঁটে দিচ্ছেন। নিম্নবর্গীয় কন্যা, গাত্রবর্ণ শ্যামা। এই পরিশ্রমের দরুন বসন বিস্রস্ত। পিঠে আলুলায়িত কুন্তল, লুটিয়ে পড়েছে তার লাল পাড় শাড়ির আঁচল। কনুই দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে কখন ঘেঁটে ফেলেছেন সিঁদুর।

এহেন অবস্থায় পরপুরুষ কৃষ্ণানন্দকে দেখে লজ্জায় জিভ কাটলেন সেই বধু। আর অমনি মা পেয়ে গেলেন কৃষ্ণানন্দঠাকুর। সংসারী কোমল গৃহবধূটি— সে-ই তো সংসারের শক্তি, তাবৎ সংসারের মা!

এই ভাবটিই মানসপটে এঁকে গঙ্গামাটি নিয়ে মূর্তি গড়তে বসলেন কৃষ্ণানন্দ। কৃষ্ণানন্দের এই মূর্তিই পরবর্তীতে দুই বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠল আর কৃষ্ণানন্দ হলেন আগমপন্থায় সিদ্ধ সাধক 'কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ'। মা প্রসিদ্ধ হলেন 'আগমাকালী' বা 'আগমেশ্বরী মাতা' নামে।

এই রূপ যন্ত্র হতে মাতৃভাবনার সাকার রূপ। তবে, মায়ের রূপের ভাবনা আগ হতেই আমাদের আছে। সাধকঠাকুর ওই

রূপশ্রীতে মাতৃভাব ও কালীকল্প গেঁথেছেন। এককথায়, মায়ের কালো মুখে ওই যে চমৎকার শ্রী, ওইটেই আমাদের ভক্তি।"

লটকন বললে, "জয় মা!"

আসলে গল্পের শেষে ঠাকুর এইটেই কন, কিন্তু আজ বাবাঠাকুর হেসে উঠলেন। বললেন, "জয় মা! কিন্তু কাহিনি যে শেষ করিনি, ভাই। এখনও কিছুটা বাকি আছে।

যত সহজ ভাবছ, তত সহজ ছিল না, ভাইয়েরা। ঠাকুর যেখানে মায়ের পূজা করবেন, তার আশেপাশের চতুর্দিকে পরম বৈষ্ণব কুলের বাস। এমন স্থলে মায়ের পূজা করা অর্থাৎ শক্তিপূজা করা বড়ো কঠিন।

আমাদের এই সমস্ত গাঁ-গঞ্জে শাক্ত, বৈষ্ণব মিলেমিশে আছে বলে তোমরা বুঝতে পারো না, কিন্তু যেখানে কোনো একটির প্রাধান্য বেশি, সেখানে বড়ো সমস্যা।

ঠাকুর কী করতেন, রাতেরবেলা মায়ের মূর্তি গড়ে রাতেই পুজো করে ভোরেই বিসর্জন দিতেন। স্থানীয় আদিবাসী মানুষজন ছিলেন, তাঁরা ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের পূজায় মেতে উঠতেন। আস্তে-আস্তে মায়ের মহিমা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বহু বছর পর আগমবাগীশ ঠাকুরের প্রপৌত্র বিবাহসূত্রে এক বৈষ্ণব পরিবারে এসে ওঠেন। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তৎকালীন সময়ে পার্শ্ববর্তী শান্তিপুরের এক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পরিবার— গোস্বামী পরিবার অর্থাৎ বৈষ্ণব পরিবারের সর্বোত্তম কর্তা তাঁরা! কী অদ্ভুত কাণ্ড দেখো!

সেই প্রপৌত্র রত্নগর্ভ সার্বভৌম তো এসে পূজা শুরু করলেন! তিনি কিন্তু ঘরজামাই ছিলেন... "

"এই যে বললে বোষ্টমঠাকুরের ঘর! ওখানে কী করে হবে তবে... " বড়দা বলে উঠল।

বাবাঠাকুর বলে চললেন, "মাতালগড় বলে একটি প্রত্যন্ত স্থানকে তিনি মাতৃসাধনার স্থল হিসেবে নির্বাচন করলেন কারণ, যতই হোক শ্বশুরগৃহে আসন স্থাপন করা যায় না। তাঁদের আরাধ্য অন্য।

এইখানে তিনি স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে সখ্য গড়ে মায়ের পূজা শুরু করেন। মা তাঁকে নির্দেশ দেন কার্তিক অমাবস্যা অর্থাৎ এই দীপান্বিতা অমাবস্যাতেই তিনি পূজিতা হবেন। এভাবেই প্রতি কার্তিক অমাবস্যায় তিনি মায়ের প্রতিষ্ঠা দিতেন, নিজ হাতে মায়ের চক্ষুদান করতেন এবং ভোররাত্রে পূজা সমাপনে বিসর্জন করতেন।

রত্নগর্ভ ঠাকুর বলতেন, শাক্ত-বৈষ্ণব এক। এ শুধু আমাদের করা ভ্রম। আসলে ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। ঈশ্বর অভেদ। তিনি কালীগান গাইতেন, আবার নাম সংকীর্তনও করতেন। সাক্ষাৎ শিবস্বভাব সাধক ছিলেন গো!

তাহলে দাদুরা, বুঝতে পারছ তো, এই যে কালী-কৃষ্ণ, কালো মা, দুর্গা, গৌরী এই যে এতকিছু আমরা ভাবছি... এ তো কিছুই নয় গো! তোমার আমার ভিতরে যে ধনাত্মকতা আছে, যা কিছু যতটুকু ভালো আছে সেই ভালোর উপরেই তিনি বসেন। তুমি যখন মন দিয়ে পড়াশোনাটা করছ, তখন তোমার এই পড়াশোনাটা হলেন তোমার মা কালী। আবার আমি যখন মন দিয়ে ধ্যান করি, তখন ধ্যান আমার মা কালিকা। মায়ের রূপ কী ধরা যায় গো! তাই তো মা বিভিন্ন রূপে এসে আমাদের ধরা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে যান।

আমার গুরুদেবের একটা কথা বলি, শোনো তবে। তখন সদ্য-সদ্য দীক্ষা নিয়েছি। দীক্ষা নিয়েছি ওই শিবপুর শ্মশানেই। একদিন গুরুদেব প্রকাশে পথ চলছি। গুরুদেব হেঁটে চলেছেন, আমি চলেছি পিছে-পিছে। শ্মশানের চালায়

এক মা সন্তানকে উদলা হয়ে দুধ দিচ্ছেন, গুরুদেব সেদিক তাকালেন। সেই মা গুরুদেবের দিকে মুখ তুলে স্মিত হেসে আবার স্তন্যদানে মন দিলেন... আমি লজ্জায় মুখ নামালাম।

গুরুদেব কইলেন, 'ও কী? লজ্জা কেন র‍্যা! ও তো মা! শিশুকে কোলে শুইয়ে সুধা দিতেছেন। ওই দ্যাখ, শিশুর ক্ষুধার্ত অধরোষ্ঠ সুধাবৃন্ত ছুঁয়ে আছে। যেমন নিচ হতে ঘাড় উঁচু করে আমরা সূর্যপ্রণাম করি— এ হল সেই সুধা নমন ভঙ্গি। ঈশ্বর সাধনার প্রাথমিক ধাপ। মা দেখেও যদি লজ্জা পাবি, তবে লজ্জা লুকোবি কোথায়? সে যে সব জায়গায়...'

তারপর একটু নরম হয়ে বললেন, 'ও রে, এই মা আজ ওর নিজের বাপকে হারিয়েছে। তাই এতটুকু কোলের বাচ্চাকে নিয়ে শ্মশানে এসেছে। এতক্ষণ আছাড় খেয়ে কাঁদছিল। অথচ দেখ দেখি, মা আমার অত কেঁদেও তাঁর সন্তানকে সুধাদান করছেন। বিষের বিষাদ নিংড়ে, যিনি অমৃত করতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মময়ী। এ-দৃশ্য অতি পবিত্র, এর মধ্যেই আমার ইষ্ট আছেন রে! এঁকে দেখব না তো কাকে দেখব? এই দর্শন সাক্ষাৎ শ্মশানকালী দর্শন!'

তাহলে বুঝলে তো, ভাইয়েরা, বোধ হল সবচেয়ে বড়ো।"

বড়দা একটা দুঃসাহসিক আবদার করে বসল, "দাদু, গুরুদেবের একটি কথা অন্তত শুনিয়ো। জানি তুমি মানা করেছ, তবু একটি বার যদি বলো... কথা দিচ্ছি আর এমন অন্যায় আবদার করব না।"

আমার চকিতের জন্য মনে হল, মা কি আমার পাশেই আছেন! মা নিশ্চয়ই অন্তর্যামী, নাহলে আমার মনের কথাটা কী করে বড়দা বলে ফেলল!

বাবাঠাকুর বললেন, "বেশ। তবে আমার গুরুদেবের না, তাঁহার শ্রী পরমারাধ্য গুরু গিরিজানন্দ অবধূতের কথা আমি

শোনাব। গুরুদেব সে-কথা আমাদের শুনিয়েছিলেন। তাঁর জবানিতেই বলি—

'চাবড়া-চাবড়া মেঘ এসে মস্তকে চাঁদোয়া টাঙিয়েছে। সুবিশাল মন্দিরপ্রাঙ্গণ একা পড়ে আছে... অম্বুবাচির প্রহর পড়েছে। মন ভালো নেই, তার মা'রে তিনি দেখতে পান না। এই মেঘ যেন তার বুকেও.... জলেশ্বরীর পাড় ভাঙার ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ বক্ষে এসে লাগে।

চত্বরের বাহিরে কুঠিঘরে বসে র'ন। জপে মন বসে না। বন্ধ কাঠের দরজাখানা দেখলেই করাঘাত করতে ইচ্ছা করে, মায়ের টান কী পো ছাড়তে পারে! দুত্তোর, শাস্ত্রকারদের কী যে সব নিয়ম!

শ্মশানের ভেতরে চলে যান। একটুকরো ছইঘরে বরং শান্তি আছে— মা মামার বাড়ি গিয়েছেন, তার জন্য অপেক্ষা করছি— এই ভেবে জপে বসা যায়।

জপে যতবারই মনোনিবেশ করেন, ততবারই মন ভেঙে যায়। বাইরে যেন কে একজন ছুটোছুটি করছে! তার দানা মলের শব্দ টিং-টিং করে কানে বাজছে।

তিনি সাধক। এ-সামান্য শব্দ তার মনোযোগ, নিবিষ্টতা ভাঙতে পারে না, অথচ ওই সামান্য শব্দ আজ নির্ঘোষের ন্যায় প্রতিভাত হচ্ছে।

এমন সময় মুহুর্মুহু বজ্রনির্ঘোষ দিয়ে বৃষ্টি নামল। সেই সঙ্গেই তাঁর ছইঘরের সামান্য অবরোধে করাঘাত জাগল।

দরজা খুলে দেখেন, মাথার উপর একবোঝা শুকনো কাঠপালা নিয়ে এক দশমবর্ষীয়া বালিকা!

বুঝলেন, এই মেয়ে জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে এসেছিল। বালিকাটি ইশারায় কাঠকুটোর দিকে দেখিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে তিনি ঘরে ঢুকিয়ে নিলেন।

সে-রাতে সেই প্রগল্‌ভ মেয়ে তাঁকে আর নামজপ করতে দিলে না।

রাত বাড়ে। মেয়েও বকে চলে— তাদের বাপ-বেটির সংসার; সংসারের দৈন্য, কীভাবে দু'হাতে সংসারকে আগলে রাখে। তার বাপের শিশুসুলভ সারল্য...

কিন্তু সাধকের মাথায় অন্য চিন্তা, এই দুর্দান্ত বৃষ্টি আর একটু হলেই জলেশ্বরীর জল বাড়বে। তখন এই ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে যাবেন কোথায়? আর মেয়েটি যে এত রাত অব্দি তাঁর গৃহে রইল, তার বাবা চিন্তা করবেন না?

অন্য চিন্তায় আবার মন্দিরের মায়ের চিন্তা। দখিনের ছাট, সব জানালা ভালো করে বন্ধ করা আছে তো? মায়ের গায়ে বৃষ্টির ছাট লাগছে না তো?

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, বৃষ্টির বেগ বাড়তে লাগল। সাধক সেই বালিকার হাত ধরে নিয়ে চললেন মন্দিরপ্রাঙ্গণে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর এই ছইয়ের ঘর ডুবে যাবে। মায়ের মন্দিরে তবুও আশ্রয় আছে। তিনি সাধক, তাঁর পাকা ঘর নেই, এই মন্দিরই ভরসা।

পথ চলতে চলতে মেয়ে কইলে, 'তুমি চিন্তা করছ, ঠাকুর, আমার বাবা খোঁজ নিল না কেন? উত্তর তুমি মন্দিরেই পাবে। দেখবে আমাদের গোটা গ্রাম আমার খোঁজ নিতে মন্দিরের পথেই আসেছে। আমরা তুফানে মন্দিরেই উঠি। পাকা ঘর নেই যে কারুর। বাপ জানে, আমিও ওখানেই থাকব। তুমি আসার আগেও এখানে এ-রকম তুফান হয়েছে। আমরা খেতে পাইনি। শোনো না, তোমার মায়ের ঘরে তো অনেক ফলপাকুড় রাখা থাকে। একা মানুষ বন্ধ ঘরে কত খাবে! সেইগুলো আমাদের দিলে আমরা খেয়ে-পরে তো বাঁচতে পারি।'

সাধকের মাথায় এসব কিছুই ঢুকল না। কেবল দুশ্চিন্তা। বালিকা বড়ো প্রগল্‌ভ। দুশ্চিন্তা না থাকলে তিনি বুঝতেন বালিকা তাঁর অন্তর-গমন করে ফেলেছে। তাঁর মনের কথা অনায়াসে বলে দিয়েছে!

মন্দির চত্বরে এসে দেখেন থিকথিক করছে লোক। মেয়েটি তার হাত ছাড়িয়ে, 'বাবা' বলে উধাও হয়ে গেল! তিনি খুঁজেই পেলেন না গোটা গ্রামের এত মানুষের মধ্যে কোনটি তার বাবা আর কোথায় বা মেয়েটি!

সাধক মায়ের দরজা মনে বসে র'ন। রাত কাটে, দিন যায়, বৃষ্টি আর থামে না। বুভুক্ষু শিশুদের কান্না তার মন ভেঙে দেয়। তিনি 'জয় মা' বলে দুয়ার খোলেন। মায়ের ভোগের ফলপাকুড় হতে কিছু খেয়ে যদি এরা আজ বাঁচে তা-ই বাঁচুক। অপরাধ যদি কেউ করে থাকে, তিনি করবেন।

কিন্তু এ কী! দুয়ার খুলে তিনি দেখলেন, মায়ের একঢাল কালো চুলে জড়িয়ে আছে শুকনো পাতা। সারা গা ভিজে, জলের ছাট নয়, যেন বৃষ্টিতে ভিজেছেন। রাঙা পায়ের রং মলিন, যেন কর্দমের প্রলেপ পড়েছে! আর পরনের এ শাড়ি তিনি চেনেন!

বিড়বিড় করে বললেন, 'মা গো তুই কী আমাকে দেখা দিলি? না এই সন্তানদের উদ্ধার করলি?'

ঝোড়ো বাতাসে ফিসফিস করে কেউ যেন কয়ে গেল, 'যা ভাববি তা-ই। বললাম তো, বাপ জানে ওখানেই থাকব।'"

বাবাঠাকুর থামলেন। আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। এ কী শোনালেন বাবাঠাকুর! আমার বালক মনও যে তোলপাড় হয়ে গেল। আকাশে গোল থালার মতো চাঁদ উঠেছে। চাঁদটি বাদে গোটা আকাশ নিকষ কালো। আর ওই চাঁদটি আমরা কতিপয় মানুষ। ওই কালো হলেন মাতা কালী, তিনি চরাচর জুড়ে বিস্তৃত হয়ে জড়িয়ে রেখেছেন এই গুটিকতক মানুষকে।

স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে বিড়বিড় করে উঠলুম, "জয় মা... জয় মা!"

।। নবপত্রিকা ও লৌকিক চণ্ডী কথা ।।

কলাবউ স্নান করানোর জন্য আমাদের ডাক পড়ত না। কিন্তু যারা শাঁখ, কাঁসি বাজিয়ে ঘড়া হাতে যেত তাদের পিছন-পিছন যাওয়ার একটা আলাদাই মজা ছিল। সেই মজাটা ভাষায় বলে অনুভব করানো যাবে না।

বাংলার অখ্যাত এক গ্রাম। মলমাসের দরুন পূজা পড়েছে আশ্বিন সাবাড় করে। শীতভোরের সর-কুয়াশাকে সাক্ষী করে, দু'ধারের ফলবতী ধানখেতকে সাক্ষী করে, একটা লম্বা সারি আনন্দে উদ্‌বেল হয়ে তাদের মা-কে, পক্ষান্তরে পিসিকে আনতে যাচ্ছে। বছরকাল পর তাদের পিসিমা আবার নিজের বাপের ঘরে ফিরছেন।

আমরা ছেলেবেলা থেকেই জানি আমাদের মা হলেন ঘরের মা। আমাদেরকে ছেলেবেলা থেকে তাই বলা হত আমাদের দুগ্গা মা হলেন আমাদের পিসি ঠাকুরন। বাবারাও তা-ই বলতেন।

পিসি ঠাকুরনের সেই কাহিনিটা আমরা সবাই শুনে এসেছিলুম, কিন্তু তবুও একবার বাবাঠাকুরের মুখ থেকে শোনার খুব ইচ্ছে ছিল। যতই হোক, ওঁদের বাড়ির মা। হালে জমিদারদের সেই সামর্থ্য ছিল না, তাই মা আমাদের বারোয়ারি আটচালায় পূজা পেতেন। কিন্তু আজও জমিদারবাড়ি থেকে বরণ, ভোগ না হলে বিজয়ার দিনে মা পাষাণের ন্যায় ভারী হয়ে যেতেন। মা-কে পাক দেওয়া যেত না।

সবাই বলত, মায়ের পাকা বদ্ধ দালান ভালো লাগে না। বছরকার জন্য আসেন। গ্রামের ভিতর সবার মাঝে এসে রয়েন।

তো সে-বারও, অমনি করে আমরা যাচ্ছি। আর বাবাঠাকুর খালের ধারে দাঁড়িয়ে ভোরের স্নান সারছেন। আমাদের দেখে বললেন, "কীগো ভাইয়েরা, নবপত্রিকা স্নানে যাও নেচে নেচে..."

আমরা তো অবাক! নবপত্রিকা আবার কী! আমাদের সেই হতবিহ্বল দশা দেখে, বাবাঠাকুর আবার প্রশ্ন করলেন, "ওই যেথায় যাচ্ছ..."

এই অবস্থায় যে উত্তরটা মুখেই থাকে সেটাই বলে দিয়েছিলাম, "কলাবউ স্থান করাতে যাচ্ছি।"

বাবাঠাকুর হেসে বলেছিলেন, "ওইখানে তো শুধু কলাগাছ নেই গো! বাউনকে জিজ্ঞাসা করো, ওখানে আরও আটখানি গাছ রয়েছে। তাহলে কলাবউ কেন?"

আমরা হেসে কইছিলুম গণেশদাদার স্ত্রী বলে! বাবাঠাকুর আহ্লাদী ধমক দিয়ে কইলেন, "কচু জানো... ওখানে কচুগাছও আছে হে, কচুগাছ কি গণেশদাদার স্ত্রী?

যাও এখন আর কথা কইব না। মা-কে স্নান করিয়ে মন্দিরে রেখে এসো গে। তারপর আমরা হালদারদের কপিবাগানে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসিয়ে... আমাকে একটু বইপত্তর ঘাঁটতে হবে।"

এইবেলা বলে রাখা প্রয়োজন, বাবাঠাকুরের ওই মাটির ঘরগুলির একটিতে মায়ের বিগ্রহ, অন্যদিকে সবার জন্য সামান্য জলচৌকি আর বইয়ের তাক। রান্না মানুষটা বাইরে করেন।

বাংলা-ইংরেজি কত রকমের বই যে তার সংগ্রহে রয়েছে তা না দেখলে ভাবা যাবে না। দোক্তাপাতা দিয়ে থরে-থরে সাজানো থাকে সেই সমস্ত বই। বাবাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "এ আমাদের সংগঠনের বই, ও-বাড়ির বই। দেশ স্বাধীন হবার পর এদের দায়িত্ব নেওয়ার মতো কেউ ছিল না। আমি নিলাম তাই।"

***

কপিবাগানে বসার মজাটাই আলাদা। ধবধবে আগাছাহীন পরিষ্কার ডাঙাজমিতে সার-সার ওলকপি, ফুলকপি, বাঁধাকপির কাজ আর মধ্যিখানে ফাঁকা পায়ে হাঁটার পথ। ওইখানটাতে মাদুর পেতে বসে গল্প করতে ভারি ভালো লাগে। মনে হত, রোদের সবটুকু মনোযোগ যেন আমরাই নিয়েছি। আমরা হলুম রাজামশাই আর আমাদের ঘিরে চতুর্দিকে, আমাদের পারিষদবর্গ এই গাছপালারা।

বাবাঠাকুর গুছিয়ে বসে বললেন, "নবপত্রিকা কথাটির অর্থ হল নয়খানি পাতা। এখানে, এই পাতাকেই খাদ্যের প্রতিকৃতি ধরছি। দ্যাখো, আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বলে গাছের পাতায় খাদ্য তৈরি হয়। গাছ বাঁচে, ফলবতী হয়। আর তবেই আমরা মানুষরা বাঁচি। তাই বৃক্ষের পূজা নানাভাবে আমাদের সমাজে সেইকাল হতেই চালু আছে। আর এইটে হল তেমনই 'পত্রিকা তথা পাতা পূজা'। এই দেখো," বলে একখানা পুঁথি খুলে বললেন, "দেখো, মা শাস্ত্রে নিজেই বলছেন,

অহম্ অখিলং লোকম্ আত্মদেহ-সমুদ্ভবৈঃ।
ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈঃ অবৃষ্টৈঃ প্রাণধারকৈঃ।।

অর্থাৎ, ভরা বৃষ্টিতে আমার দেহ হতে শাক উৎপন্ন হবে, সেই শাক দ্বারা সমস্ত জীবকুল প্রাণ রক্ষা করবে। তাই আমি শাকম্ভরী।

কলাবউ তথা নবপত্রিকার উপলব্ধিটা ঠিক এখানেই। যেখানে সমৃদ্ধি এবং লালন হচ্ছেন বীজ আর মাতৃকা হচ্ছেন গর্ভাশয় এবং আশ্রয় — অর্থাৎ নয়রকম শাকে, নয়টি ভিন্ন দানে তিনি আমাদের লালন, পালন ও শাসন করে থাকেন। নবপত্রিকা কলাবউ অর্থ হল ব্যাচ প্রোডাকশন বা বহু-প্রজননের প্রতীক। আদতে উহা সামগ্রিক সৃষ্টি ও সমৃদ্ধি।"

"সেটা কেমন হয়?" প্রশ্ন করেছিলুম।

"এই যেমন ধরো কলার কাঁদি কিংবা মোচার ফুল বা সুপুরির চাঁবালি! থরে-থরে সাজানো ফল— এরা আদতে হল সমৃদ্ধির লক্ষণ।

নবপত্রিকার নয়টি পাতা তথা গাছ হল— কলা, কচু, হলুদ বা হরিদ্রা, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু। প্রতিটি গাছের পাতা কিংবা চারা একত্রে বেঁধে তবেই নবপত্রিকা। এই নয়জন তাদের কর্মে নয় দেবীকে নিদর্শ করায়।

কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রাহ্মণী। কচুর কালী, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বেলের শিবা, ডালিমের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা ও ধানের লক্ষ্মী। সমবেতভাবে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দুর্গা। নবপত্রিকায় এই সমস্ত দেবী পূজিত হন।

ডালিম খেলে রক্ত হয়, আবার দন্ত রক্তবর্ণ হয়। সপ্তশতী দেবী রক্তদন্তিকার মাহাত্ম্যও অমন। দানব বধে তাঁর দন্ত রক্তবর্ণ। হরিদ্রা হল সামগ্রিক মঙ্গল, মা দুর্গাও তাই। মানকচু হলেন বিভীষণ! সাক্ষাৎ শমন... তিনি আদ্যা চামুণ্ডা। তাহলে, কেউ রোগপ্রতিরোধে, কেউ পুষ্টিতে, কেউ নিরাময়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এবার বুঝতে পারছ তো ভায়েরা?"

"আচ্ছা কাকা, একটি কথা বলো। তুমি তো অনেক স্থানে ঘুরেছ। অনেক স্থান দেখেছ। এই নবপত্রিকাকেই মুখ্য করে মায়ের পুজো হয় এমন একটা কথা আমি কোথাও শুনেছিলাম, এটি কি সত্যি?"

এই বাগানটা হরিকাকা আর কদমকাকাদের বাগান। আমরা রোদ পোহাতে-পোহাতে গল্প করছি আর দুই কাকা অনেকক্ষণ ধরে বাগান নিড়োচ্ছিল। বুঝতে পারলাম দু'জনে নীরবে সব কথা শুনছিল। আসলে আমাদের বাবাঠাকুরের গল্প

বলার ঢংটিই অমন। তিনি কাহিনি বলবেন আর কেউ পাশে থেকেও শুনবে না, এমন হতে পারে না।

বাবাঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ রে হরি, এই কদম, তুই পাশে এসে বস।

সেই সময় আমি হাওড়া থেকে বেরিয়ে পদব্রজে বর্ধমান এসে পৌঁছেছি। বর্ধমানের মঙ্গলকোট অঞ্চলে ক্ষীরগ্রামে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এবং মঙ্গলকোট গ্রাম মোটামুটিভাবে নিরুপদ্রব ছিল বলে, সেই সময় আমাদের সভা ও সমিতি যোগাদ্যা মায়ের মন্দিরপ্রাঙ্গণে হত। কী আশ্চর্য, এই যোগাদ্যা মা দুর্গা হয়েও নবপত্রিকাতেই পূজিতা। যতটুকু আমার জ্ঞান, এ-বঙ্গে তিনি একমাত্র, যিনি নবপত্রিকায় পূজিতা... কী কপাল দেখো! মা বোধহয় নিজেই চান তাঁর মহিমা এই অভাজনের দ্বারা বর্ণন হোক..."

: যোগাদ্যা মা :

"বিধিমতে নবপত্রিকাকে নদী বা পুষ্করিণীতে অথবা অধুনা বারোয়ারি পূজায় আটচালায় গড়খাই করে উষ্ণোদকে স্নান করিয়ে দেবীকে স্থাপন করা হয় গণেশ দেবতার পার্শ্বে। কাঠের সিংহাসনে আসীন দেবী পূজা পান, সপরিবার দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গেই।

কিন্তু বর্ধমান মঙ্গলকোটের ক্ষীরগ্রাম এমন এক গ্রাম, যেখানে শত-শত বছর ধরে দেবীর পূজা কেবলমাত্র নবপত্রিকাতেই সমাপন করা হয়। অজস্র মণ্ডপ, কিন্তু কোনো মণ্ডপেই দেবীমূর্তি থাকত না। নবপত্রিকাই সেখানে দেবীর প্রতিভূস্বরূপ। দেবীর মূর্তি বা প্রতিমায় পূজা হয় না। মা যোগাদ্যা দেবী দুর্গারই আর এক নাম। যোগ + আদ্যা, অর্থাৎ যোগসাধন দ্বারা প্রাপ্ত আদ্যা মহামায়া।

মা যোগাদ্যার এই পীঠ পবিত্র শক্তিপীঠ। কথিত আছে দেবীর ডানপায়ের বুড়ো আঙুল পড়েছে এ-স্থানে। মা যোগাদ্যার প্রাচীন মূর্তি কিন্তু আদি দশভুজা, মহিষমর্দিনী মা দুর্গা। এই মহিষমর্দিনী রূপের এক গাথা আছে।

বহুকাল পূর্বে নাকি মায়ের পূজায় নরবলি হত। প্রতিবছর বিভিন্ন ঘর থেকে পালা করে সন্তান নেওয়া হত। এক বছর পালা পড়েছিল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতির, তাদের বুড়ো বয়সে অনেক সাধ্য-সাধনা করে একটি সন্তান হয়েছে।

মায়ের বিধান অগত্যা তারা মায়ের কাছে কেঁদে পড়ে এবং শেষমেশ মতি স্থির করতে না পেরে সন্তান নিয়ে পালিয়ে যায়। পথিমধ্যে মা তাদের দর্শন দেন। ভক্তকে তিনি বলেন 'ভয়ের পূজা আমি চাই না। আজ থেকে নরবলি রদ হল।'

পরবর্তীতে সেই নরবলিকে মহিষবলিতে পরিণত করা হয় এবং তাই মা হলেন সাক্ষাৎ দেবী মহিষমর্দিনী।

একবার মায়ের প্রাচীন ও পুরাতন মূর্তিটি হারিয়ে যায়।

বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ মা যোগাদ্যার হারিয়ে যাওয়া মূর্তিটির অনুকরণে দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি তৈরি করান। মন্দিরও গড়ে দেন। কিন্তু নতুন তৈরি হওয়া মূর্তিটি সারা বছর ডুবিয়ে রাখা হত ক্ষীরদিঘির জলেই। কেবল বৈশাখ সংক্রান্তিতেই জল থেকে তুলে এনে সর্বসমক্ষে রাখা হত। বিশেষ ছয়টি দিন ছাড়া মায়ের পূজা কখনোই মূর্তিতে হয় না।"

"কোন-কোন দিন, দাদা?"

"বৈশাখ সংক্রান্তির আগের দিন এবং জ্যৈষ্ঠের চতুর্থ দিন, আষাঢ়ী নবমী, বিজয়া দশমী, পৌষার্ধ এবং মাঘী মাকরী সপ্তমীতে দেবীকে জল থেকে তুলে পুজো করা হয়।

তোমাদের মা বনদুর্গার কথা বলেছিলাম মনে আছে? এইখানে এর প্রচলিত কথারা বলে, এ-ই সেই গ্রাম... এই

গ্রামেরই ঘাটে বধূবেশে শাঁখা পরেছিলেন মা উমা, তাই মায়ের শাঁখা পরানো হয় বৈশাখ উৎসবে।

বৈশাখ উৎসবের আগে ও পরে কৃষিকাজ, কর্ষণ বন্ধ রাখা হয়। কারণ যোগাদ্যা দুর্গা সাক্ষাৎ শাকম্ভরীর রূপ। তিনি কৃষিকাজের দেবী হিসেবে পূজিতা। এবং দেবী সেই কৃষিকাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেই পাঁচদিন তার নবপত্রিকায় পূজা হয়।

দুর্গাপুজোর সময় এখানে নাকি মা-কে নবপত্রিকাতেই পুজো করা হয়। গ্রামের বারোয়ারি পূজার কথা বলছি। নতুন করে কোনো প্রতিমা আসে না। বিজয়া দশমীর দিন মা-কেই সবাই দর্শন করে।

নবপত্রিকা অর্থাৎ মাতৃছায়া, ফসল, প্রজনন ও উর্বরতা।

আর এভাবেই লৌকিক মাতা যোগাদ্যা আর দুর্গা মিলে মিশে গেছেন অঙ্গাঙ্গীভাবে লৌকিক দর্শনে।"

বাবাঠাকুর উঠে পড়েছিলেন। তাঁর দ্বিপ্রাহরিক নামজপের সময় হয়েছে।

সবাই আমার গা ঠেলছিল। আমি তাই আমতা-আমতা করে কইলুম, "দাদা, সবাই বলে মা তোমাদেরই ঘরের মেয়ে। আমরা সে কাহিনি, বড়ো ভাসা-ভাসা জানি। তুমি নিজের মুখে সেই কাহিনিটি যদি একটিবার বলো একবার।"

বাবাঠাকুর আবার বসলেন। বাড়ির কথা হলেই মানুষটার মধ্যে অদ্ভুত এক পরিবর্তন দেখি। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। কাঁপা-কাঁপা গলায় মানুষটা বলতে শুরু করলেন সেই অদ্ভুত কাহিনি।

"ভবতারণকাকাকে দেখতাম কেবল চোখ আঁকতেন। একরাশ কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কইতেন, 'আমি পটুয়া নই, কেবল এইটুকুই আমার কাজ।' আশ্বিন শেষের বাতাস চড়চড় করত রাতের মিহি হিম ধরে, নিথর হয়ে রইত অমাবস্যার রাত... কাকা সামান্য ফলার করে, পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে কাপড়ের টঙে ঢুকতেন।

ধরা-বসা গলায় বোল তুলতেন, সে অজানা মাতৃগান, ভাই। বিষাদ আর অপূর্ব বোল হাত জড়াজড়ি থাকত সে সুরে। রাতচরা পাখিগুলোর টিঁ-টিঁ থমকে যেত হঠাৎ। কুকুরগুলোও নিঃশব্দে গুটিয়ে নিত মুখ। জমাট ঘন হয়ে আসত চারিপাশ... কেবল কেঁপে-কেঁপে ভেসে আসত আকুল আবেগ, 'যন্ত্রণা জানিস রে মা, প্রলেপ কেন দিলিনে র‍্যা...'

আমরা অনুভব করতুম, তুলির নরম ছোঁয়ায় পরম মমতায় নিজের সবটুকু আলো তুলে দিচ্ছেন ওই মৃন্ময়ী চোখদুটিতে...সরু তুলি দিয়ে মণিটা আঁকলেই মৃন্ময়ী চোখ মেলে দেখবে তার বাপকে।

ভবতারণ কাকা বড়ো পটুয়া ছিলেন। সীতাদিদি অর্থাৎ সীতাঙ্গিনী দিদি ছিল কাকার একমাত্র মেয়ে। সীতাদি বড়ো অসময়ে চলে গেছিল। সে-বছর ওলাওঠা রোগ, মানে কলেরা আশেপাশের তিনটি গ্রাম উজাড় করে দিয়েছিল।

মেয়ের বার্ষিক করে কাকা মূর্তি গড়ার ঘরটা ভাইপোদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। বলতেন, 'আমার আলো বলতে আর কিছু নেই। তোরা গড়। এই দৃষ্টিটুক আছে। এটুকু দেব ওই মাটির মায়েরে... ও বেটি বাপের স্নেহ দেখে না, ও অন্ধ। এই কয়দিন এই ভাঙাচোরা বাপটার চোখের আলো নিয়ে মা দুগ্গা, আমার সীতা হবে।

ঠাকুরদা স্বপ্ন দেখেছিলেন, সীতাদিদি এসে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের দালানে দাঁড়িয়ে বলছে, 'এইখানেই আমি রইলাম, জ্যাঠাবাবা। আমার বাপ আমাকে বড়ো মায়ায় এখানে বেঁধে দিয়ে গেল।' সেদিনই ঠাকুরদা বলেছিলেন, এ-মা আমাদের সীতা-মা, আমাদের ঘরের মেয়ে!

দু'বছর পর ঠাকুরদাদা চলে যান। বাবা এই জমিদারির স্বত্বাধিকারী হন, কিন্তু মা আমাদের ঘরের মেয়ে, আমাদের ফলসা পাড়া সীতাদিদি...

।। সনকা সর্বমঙ্গলা ।।

"তখন আমি কেবল হেঁটে চলি, বুঝলে। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম আমি হেঁটে চলি। ভিতরে তখন বৈরাগ্য অদ্ভুতভাবে টান দিয়েছে। মাতৃদর্শন নিজের মা-কে দেখার মতোই শান্তি দেয়।

নিজের সামান্য সামগ্রী নিয়ে হেঁটে চলি। সংগঠনের কাজের বাইরে আমার মন পড়ে থাকে মাতৃদর্শনে। মেদিনীপুরে আমাদের উপরে কড়া নজর থাকত, তাই বনপথে ভ্রমণ করতাম বেশি। যদিও আমাকে সহজে ধরার উপায়টি ছিল না। তবুও এমনভাবেই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

সে-ভাবেই পথ হাঁটতে-হাঁটতে লোধাদের একটি গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আসলে সেই গ্রামের পরিবেশটি এতই অপরূপ, যে ভাবা যায় না। অমন পরিষ্কার, শ্লেটরঙা আকাশ আর নক্ষত্রখচিত সন্ধ্যা দেখে আমার আর পা বাড়াতে মন করেনি। ওখানেই রাত্রিযাপন করেছিলাম। ভাগ্যিস করেছিলাম! তাই তো মাতৃদর্শন ভাগ্যে জুটে গিয়েছিল।

সকালে ঘুম ভেঙেছিল শাঁখ-কাঁসর ঘণ্টার উচ্চগ্রামে। ব্রাহ্মমুহূর্তে ধ্যান করা অভ্যাসে পরিণত করতে চাইছিলাম একটু-একটু করে। কিন্তু কীভাবে যেন পথের ক্লান্তি সে-রাতে আমাকে পেড়ে ফেলেছিল। তড়িঘড়ি উঠে স্নান সেরে রক্তাম্বর পরে মায়ের জপে বসেছি। আমি জপের কালে পরিচ্ছন্ন রক্তবস্ত্র পরতাম, ওইটুকুই ছিল।

জপ সেরে দেখি আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ আমার দরজায় দাঁড়িয়ে! এঁর ঘরেই আমি রাত্রে ঠাঁই নিয়েছি। বললেন, 'আপনি কি

মাতৃসাধনা করেন?' তাহলে মা-ই আপনাকে এনেছেন। একবার আসবেন আমার সঙ্গে?'

পিছু পিছু আমি চলেছিলাম..."

***

"বৃদ্ধ লোধা পুরোহিত আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন মায়ের সম্মুখে। আহা, সিঁদুর-চর্চিত শিলা যেন পরম দ্যুতিময়! আমাকে বললেন, 'বাবা, তুমি রক্তাম্বর নিয়েছ। মা-র সঙ্গে তোমার নিত্যদিনের ঘর-বা'র। নতুন করে তো বলার কিছু নেই। তবুও মনের যদি কিছু বাসনা থাকে সেটি ওই শালপাতায় লিখে দাও।'

মাথা তুললাম। হাতের চেটো খুলে আকাশটা ধরে আছে শালগাছেরা। পাতার ভীষণ জটাজাল থেকে চুঁইয়ে নামছে আলোর বিন্দু। মহুয়ার সুবাস আর তার মাঝে ধুপধুনোর গন্ধে ম-ম করছে মন্দিরপ্রাঙ্গণ, যেন সাক্ষাৎ অমরাবতীর কানন।

শুনেছি, রাজা নিজে মা-কে নিয়ে যেতে পারেননি। মা এই পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে এখানেই থাকতে মনস্থ করেছিলেন। তিনি তাই স্থানীয় লোধাদের মা হয়ে লোধাদের হাতেই সেবিতা। পরে রাজা মন্দির গড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু মা এখানেই আছেন আজও।

শালপাতাটি ধুয়েমুছে এনে সিঁদুর দিয়ে তাতে একটি চিহ্ন এঁকে মনস্কামনাটি লিখতে বললেন লোধা পুরোহিত বা দেহুরি। কইলেন, 'মা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। এই যে মায়ের পায়ে ছুঁয়ে দিলুম। যা চাও তা-ই পাবে।'

আমি তো কেবল মনে-মনে মা-কেই পেতে চেয়েছিলুম। মা আমাকে দেখা দিয়েছিলেন। দেখা দিয়েছিলেন লাল দুর্গা রূপে। যেমন এখানে সিন্দুরচর্চিত মা!

মা যেন তেমনই সিন্দুরের অঙ্গরাগ করে আমায় দেখা দিয়েছিলেন, সে-কাহিনি তোমাদের পরে বলব।

শনিবারের সে পূজা সেরে আমি আর দেহুরিঠাকুর মন্দিরের পিছনে অক্ষয়ঝোরার পাশটিতে বসেছিলাম। ওই ঝোরার ইতিহাস বড়ো প্রাচীন। মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ওই ঝোরার জল নাকি কেউ কখনও শুকোতে দেখেনি। এই ঘন জঙ্গলে মাঝে-মাঝেই বৃষ্টির আকাল পড়ে, কিন্তু ওই জল শুকায় না।

তারপর সে দেহুরি শুরু করেছিলেন সেই অনিন্দ্য কাহিনি।

যে স্থানে আমরা বসে ছিলাম, সেই গোয়ালতোড় সুপ্রাচীন বগড়ি রাজ্যের অংশ। এই বগড়ি রাজ্য ঠিক কতটা প্রাচীন কেউ বলতে পারে না। কিন্তু সুপ্রাচীন কাল হতেই এই স্থানের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ জড়িয়ে রয়েছেন। এমনকি এই মন্দিরের সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ।

'মহাভারতের কালে, বনবাসে বকাসুরকে বধ করেন ভীম। ভ্রাতা ভীমকে অভিবাদন জানাতে আসেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর সেই আগমন উপলক্ষ্যে এখানে স্মারক মূর্তি তৈরি করেন পঞ্চপাণ্ডব। সেই মূর্তি গোবিন্দজিউ রূপে আজও রাজমন্দিরে পূজিত।

তারপর বহু কাল কেটে গেছে। এই রাজ্যে আইচবংশীয় রাজারা রাজত্ব করেছেন। রঘুপতি সিংহ সত্তর বছর ধরে রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছেন।

তাঁর ধর্মপ্রাণ নায়েব রাজ্যধর রায়, তিনি স্বপ্নে শ্রীক্ষেত্র দর্শনের নির্দেশ পান। শ্রীক্ষেত্র দর্শনে যান রাজ্যধর ও তাঁর পত্নী সনকা। সেই পথ হতে ফেরার সময় এক ব্রাহ্মণের হস্তে তিনি পান কৃষ্ণারায় মূর্তি ও তার দেবীকে।

এই কৃষ্ণরায় মূর্তির আবার সুপ্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। কোন এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ তাঁর পত্নী ঊষাকে

শ্রীকৃষ্ণের অনিন্দ্যকান্তি শোভা বর্ণনা করতে অক্ষম হয়ে শিল্পীদের দ্বারা তাঁর মূর্তি গড়িয়েছিলেন। সেই মূর্তি দিয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। সেই মূর্তি পরবর্তীতে কৃষ্ণরায় মূর্তি নামে খ্যাত।

যে-কথা বলা হচ্ছিল... সেই মূর্তিযুগলকে নিয়ে ফেরার সময় তাঁরা বনমধ্যেই বিশ্রাম নেন। সে-ই আমাদের গোয়ালতোড়ের অরণ্য। স্বপ্নে সনকাদেবী দেখেন, মা এসে তাঁকে বলছেন এই স্থান তাঁর বড়োই পছন্দ হয়েছে; এখানেই, এ-বনভূমেই তিনি রইতে চান।

ঘুম ভেঙে আছড়ে পড়েন সনকা। কৃষ্ণরায়ের সে মূর্তি অনায়াসে মাথায় তুলে নিতে পারেন। কিন্তু মায়ের মূর্তি অটল, নিস্পন্দ, জগদ্দলের মতো ভারী। অনেক সাধ্য-সাধনা করেও মা-কে নাড়ানো যায় না।

শেষে যাওয়ার কালে কাঁদতে-কাঁদতে সনকা বলে যান, মা, তুমি যখন আমার কাছে সেবা নিলে না, তখন আমি আমার ভক্তির সবটুকু দিয়ে বলে যাচ্ছি, তুমি ব্রাহ্মণ দ্বারা কখনও পূজিত হবে না। তুমি পূজিত হবে মদ, মাংসে... বামাচারে। লোধাদের দেহুরিদের দ্বারা পূজা পাবে তুমি।

পরদিন, রাজ্যধর রায় ও সনকা কৃষ্ণরায়ের একাকী মূর্তি নিয়ে রাজত্বে গিয়ে পৌঁছন। রাজাকে সমর্পণ করেন।

সব শুনে রাজা ছুটে আসেন সেই সময়ের প্রসিদ্ধ সাধক ভট্টঠাকুরকে নিয়ে। কিন্তু মা-কে ঠাঁইনাড়া করা যায় না। কারণ, মা যে ততক্ষণে পূজা পেয়ে গেছেন। লোধা কল্লাদাররা মা-কে বামাচারে পূজা দিয়ে সেই স্থলে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। সনকার অভিসম্পাত ফলে যায়।

ভট্টঠাকুর হাতজোড় করে বললেন, মা, তোমার যখন এইটেই ইচ্ছে, তুমি এখানেই থাকো। আমি তোমার ঘর গড়িয়ে দেব। ছেলের হাত থেকে সে ঘরটুকু তুমি নিয়ো।

সেই থেকে মা আমাদের এখানে এমনই ভাবেই রয়ে গেছেন। ভক্ত সনাকার নামে মা মোদের সনকা।'

তা-ই তো, মা আমাদের ঘরের মা। নাহলে পরম বৈষ্ণব রাজা মায়ের মন্দির করে দেন!

'তারপর?' এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। বৃদ্ধের আঞ্চলিক কথ্যে ভক্তি ধরে নিয়ে মধু ঝরছিল যেন।

'তারপর আর কী, রাজা ধুমধাম করে কৃষ্ণরায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আজও এই দোল দিক-দিক থেকে বহু মানুষ ছুটে আসেন দেখার জন্য। এমন জাগ্রত রাধাগোবিন্দ গোপভূমিও বোধহয় নেই। পথে যেতে যেতে শুনবে ঠাকুর, বগড়ির কৃষ্ণরায়/ হুড়কো খুলে মুড়কি খায়...'

আমাদের পূজার তখনও খানিকটা বাকি ছিল। মায়ের কাছে মানত করে, ছলনের একটি ছোট্ট ঘোড়াকে লাল সিঁদুর চর্চা দিয়ে লাল শালুতে করে বেঁধে আসতে হয়। মনস্কামনা পূর্ণ হলে সেই পুতুলটি খুলে দিয়ে এবং সাধ্যমতো মায়ের পূজা দিয়ে আসতে হয়।"

আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম। বাবাঠাকুর থামালেন, "যাও কোথা... গ্রামের সবাই যাত্রা গেছে। তোমরা যাবে না বলাবলি করছিলে শুনেছি। তাহলে, বসোই নাহয় খানিক... পড়াশোনার পাট যখন নেই। আমি এখানে মায়ের আরতি করব, শীতলভোগ খেয়ে যেয়ো।

তারপর সবাই মিলে, চারুদের ওই খেত মোনার মাচায় উঠব। চাঁদের আলো মাখতে-মাখতে শোনাব, আর এক কাহিনি... আর এক মাতৃতীর্থের রজঃ মাথায় নেওয়ার কাহিনি। সে কাহিনি অমন রাত্তিরেই জমে।"

সে-রাত্রে মাচায় বসে আকাশের দিকে চেয়ে আমরা বাকহারা দেখেছিলাম, যেন মস্ত এক তুঁতে জমিনের শাড়ি

এলিয়ে আছে, একপাশের মস্ত চাঁদটা একাকী দাঁড়িয়ে আছে আর সারা জমিন জুড়ে জ্বলজ্বলে জরির মতো অজস্র আলোকবিন্দু। সে সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন!

আমাদের ঠিক পাশে বসে গমগমে স্বরে বাবাঠাকুর আমাদের নিয়ে চলেছেন তারা ভরা আকাশের নিচে, কখনও জঙ্গল ভরা পথের ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত প্রাঙ্গণে... সেখানে তখন হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া বইছে।

"কৃষ্ণরায়ের ডাক আমি সাড়া না দিয়ে পারিনি। রোজ রাতে যখন আমি ঘুমিয়ে পড়তাম, এক অদ্ভুত বাঁশির শব্দ এসে আমাকে বেঁধে ফেলত। আমি ছটফট করতাম। বনে-বাদাড়ে বাস নেওয়া মানুষ আমি, ভরা জঙ্গলে, ধু-ধু শ্মশান-চড়ায় সেই বাঁশির শব্দটি কোথা থেকে আসত তা অনুধাবন করতে পারতাম না। কিন্তু অনুমান ঠিকই করতে পারতাম সেই শব্দের আকুলতা।

কথায় আছে, ভগবানকে দেখতে চাইলে তিনি নিজেই ডাকেন। আমাকেও কৃষ্ণরায় ডেকেছিলেন। আমি পায়ে হেঁটে গড়বেতার গড়ে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। দর্শন করেছিলাম সেই অপরূপ কৃষ্ণরায় মূর্তি, শ্রীকৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের নিজ হাতে গড়া মূর্তি।

সে-রাতে আমি এক নিকটবর্তী শ্মশানে রাত্রিবাস করেছিলাম। মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরের কাহিনি আমাকে বড়োই আকৃষ্ট করে তুলেছিল। মাতৃদর্শনের জন্য উন্মুখ হয়ে পড়েছিলাম। মায়ের মন্দির উত্তরমুখী, এমন অদ্ভুত ঘটনা ইতোপূর্বে আমি শুনিনি।

কেউ বলে সহস্র, কেউ বলে দ্বিসহস্র বছরের বেশি সময় ধরে পূজিতা মা সর্বমঙ্গলা।

শ্রীশ্রী মা সর্বমঙ্গলা দশভুজা দেবী দুর্গা। মায়ের মহিষাসুরমর্দিনী রূপ। কালো, তৈলচর্চিত শিলায় খোদিত

মায়ের মূর্তি! অপূর্ব শোভা সে মাতৃমূর্তির! শিলায় যে অমন প্রাণবন্ত মূর্তি হতে পারে, তা না দেখলে বোঝা যাবে না!

অদ্ভুত এক সৌরভ যেন ছড়িয়ে রয়েছে সেই মন্দিরের গর্ভগৃহে। দ্বীপাধারের নরম আলোয় উদ্ভাসিত মায়ের শ্রীমুখ। শতাব্দের পর শতাব্দ স্নেহ আর শান্তি শীতলপাটির মতো বিছিয়ে রয়েছে গর্ভগৃহের প্রস্তরে। মনে হবে, আহা, দু'দণ্ড বসে নিই!

মন্দিরের মহান্তের কাছে শুনেছিলাম মায়ের গাথা।

কোনো এককালে এক যোগীশ্রেষ্ঠ এখানে এসে সাধনভজন শুরু করেন। পরবর্তীকালে তার ফেলে যাওয়া পঞ্চমুণ্ডির আসনে উজ্জয়নরাজ বিক্রমাদিত্য এসে সাধন ও সিদ্ধি লাভ করেন।

বড়দা তড়বড় করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বাবাঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ, সেই বেতালের রাজা বিক্রমাদিত্য। এর সঙ্গে সেই বেতালসিদ্ধির ঘটনাও আছে। "

আমি প্রশ্ন করেছিলুম, "গড়বেতা নামটিই তো বড়ো অদ্ভুত। বেতাল মিশে আছে যেন! "

"আছেই তো, তবে এরও একটি চমৎকার ইতিহাস আছে। তোমরা এখন ইতিহাস পড়া শুরু করেছ। নিশ্চয়ই জানো, ভারতবর্ষ অন্যতম গৌরবময় হল একটি যুগ হল গুপ্তযুগ।

বড়দা তিড়িং করে লাফিয়ে বলল, "হ্যাঁ, সমুদ্রগুপ্ত আর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উল্লেখযোগ্য সম্রাট... "

বাবাঠাকুর বললেন, "সঠিক। এই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই হলেন বিক্রমাদিত্য। ওইটাই তাঁর উপাধি। এই সমস্ত অঞ্চল তাঁদের সুশাসনে নিয়ন্ত্রিত ছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য ভয়ানক কুশলী শাসক ছিলেন। তাঁর অনেক ঘটনা। একসময় অপদার্থ ভ্রাতা ও প্রিয়জনদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি রাজত্ব ত্যাগ করে শ্মশানে-শ্মশানে শান্তির খোঁজে ঘুরে বেড়াতেন।

সেভাবেই তিনি এই নির্জন অঞ্চলে এসে উপস্থিত হন। বলাই বাহুল্য, এ-অঞ্চল তখন বনভূমি এবং ভীষণ শ্বাপদসংকুল। রাজা এখানেই সেই প্রেত বেতালের স্পর্শে আসেন। সেই বেতালের কথা তোমরা সবাই জানো... বেতাল রাজাকে প্রশ্ন করতেন। রাজার উপলব্ধি এবং বোধের পরীক্ষা নিতেন। রাজার সঠিক উপলব্ধি এবং বোধের পরিচয় পেলে, তবেই বেতাল রাজার সঙ্গ দেন। কিন্তু এ-সকলই হল গল্পকথা। তাল এবং বেতাল আমাদের তন্ত্রমতে দুইটি পিশাচ। এ-বিষয়ে বেশি জানার তোমাদের প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, এ-পিশাচের জন্য শবসাধন লাগে। সম্ভবত রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে মা সর্বমঙ্গলার মন্দির স্থাপনাকারী সাধকের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং সেই সাধকের পঞ্চমুণ্ডি আসনে তিনি সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন।

এইবারেই হয় আসল ঘটনা। সিদ্ধিলাভের পর তিনি তাল এবং বেতালকে বলেন তাদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে। তারা নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে গিয়ে, মন্দিরকে দক্ষিণমুখী থেকে উত্তরমুখী করে। এরপর মায়ের কৃপায় তিনি শক রাজ্যের হাত থেকে নিজেও রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। দুরাচারী ভ্রাতাকে হঠিয়ে সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসেন।

বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে, তাঁর কর্মকার সেনাপতি বেত্রবর্মা এই মায়ের মন্দির সংবলিত নগরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বেত্রবর্মাই শহর রক্ষা করার জন্য একটি দুর্গ বা গড় নির্মাণ করেন। তাই শহরটির নাম ছিল বেত্র-গড়। 'বেত্র-গড়' শব্দবন্ধটি সময়ের মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে 'গড়-বেত্রা' ও পরে 'গড়বেতা' হয়।

পরবর্তীতে গড়বেতায় যখন বড়গি রাজ্য স্থাপতি হয়, বড়গির আইচ-রাজা নৃপতি সিংহ মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করান।

মন্দিরটিও যেন বিস্ময়! চারটি ভাগে বিভক্ত বিশাল প্রাঙ্গণ জুড়ে গরুড়ের ডানার ন্যায় ছড়ানো ব্যাপ্তি।

প্রধান মন্দিরটি যেন পরপর তিনটি চৌকো রথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে জুড়ে আছে জগমোহনের ত্রিকোণ পিঢ়া। চিত্রবিচিত্র, খোদিত দেয়ালে চৌষট্টি যোগিনী, নাগিনী আরও কত কী!

মূল মন্দিরে বসতে দেয় না। বাইরে একটি চারচালা মতো জায়গা ছিল। সেইখানে আমি বসে রইলাম। কখন যে এই দিনের আলো ফুরিয়ে রাত্রি নেমে এল, বুঝতেই পারিনি। সারি-সারি প্রদীপ জ্বলে উঠল মন্দিরপ্রাঙ্গণে। মনে হচ্ছিল মা আমার আলোর শৃঙ্গার করেছেন।

ওইখানে আমি তিন-চারদিন ছিলাম, জানো। আমার ইচ্ছাই ছিল না ওই স্থান ছেড়ে আসতে...

তবে, তারপরেই মেদিনীপুরে সেই ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটল। আমাদের বিপ্লবীদের জন্য মেদিনীপুরে থাকা ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে উঠছিল। আমিও মায়ের কাছে প্রণাম করে চলে এসেছিলাম।"

"কোন ঘটনা, দাদু?" কাশেম বলল।

"ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডগলাসকে শাস্তি দেওয়া! ১৯৩২-এর এপ্রিল। এত গভীর ইতিহাস তোমাদের কবে পড়ানো হবে জানি না, ভাই। তবে জেনে রাখো, ভারতীয় বিপ্লবীরা বইয়ে পড়ানো ওই হাতেগোনা কয়েকটি ঘটনা ঘটায়নি বা কেবল সাহেবও মারেনি। তারা দেশের জন্য অনেক কিছুই করেছে, যা হয়তো এই নব্য স্বাধীনতা পাওয়া দেশ কোনোদিন স্বীকারও করবে না। যা-ই হোক, তোমাদের মন আর ভারী করব না। আসলে বক্তৃতা দেওয়া স্বভাব তো, বেরিয়ে আসে এই বুড়োবয়সেও!

আশা ছিল মা-কে আর একবার দেখতে যাব। সে-বার পরে মায়ের কাছে আবার গিয়েছিলাম।"

আমি বললেম, "এবার গেলে আমরাও যাব, দাদু!"

।। বাণিজ্য-ব্রত ও সমাজচিত্র ।।

দুর্গাপূজার সময় দুপুরবেলাগুলো গোটা গ্রামের মানুষ আটচালাতেই কাটাত। আসলে সেই কালটা এই কালের মতো এত অবসরপ্রধান হয়ে ওঠেনি। দুপুরে যে যার বাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে দালানে এসেই বসত।

যুদ্ধের বাজারে কয়েকজন কিঞ্চিৎ পয়সাকড়ি করেছিলেন। তাঁরা আর জমিদারবাবুরা মিলে আমাদের আটচালার দালানঘরটি পাকা করে দিয়েছিলেন। সেই পাকা লম্বা দালানের প্রথম চার থাম অবধি বয়স্করা বসতেন। শেষের চার থামে যুবক, মধ্যবয়সী মানুষজন বসতেন, তাস-পাশা খেলতেন। আর মধ্যের চার থামে মস্ত দু'খানা বাঘবন্দি খেলার ছক ঘিরে আমরা ছোটোরা বসতুম।

বাঁধানোর সময় সিমেন্টের ওপর কর্ণি দিয়ে এঁকে নেওয়া হয়েছিল ছক।

বাবাঠাকুরও দুর্গাপুজোর সময় আটচালাতেই বসতেন। ফি-বছর চণ্ডীপাঠ বাবাঠাকুরই দায়িত্ব নিয়ে করতেন।

সপ্তমীর বিকেলবেলা, রোদ এসে দালানটাকে গরম করে তুলছে আর আমরা একটু-একটু করে ভেতরের দিকে সরে বসছি। এমন সময় নিধুকাকা আর বিধুকাকা এলেন। কাকাদের কলকাতার বড়বাজারে লোহালক্কড় আর রঙের ব্যাবসা আছে।

পুজোর আগে ব্যাবসা বুঝে, হিসাবপত্র বুঝে টানা দশদিনের জন্য দোকান বন্ধ করে বাড়ি আসতেন দুই ভাই। গ্রামের

লোকেরা বলতেন, 'এঁরা হলেন আমাদের চক্ষু। রেডিওর খবরে যা শুনি তা বাসি। এঁরা আমাদের টাটকা খবর দেন।' তাই, কাকারা এলেই, বুঝি ছাই আর না বুঝি, কাকাদের ঘিরে বাচ্চা-কাচ্চা, ছেলে-বুড়ো সবার ভিড় লেগে যেত। তা ছাড়া, কাকারা তিলের চাক আনতেন এইটা আমাদের ভীষণ প্রিয়।

আজকেও তা-ই আলোচনা চলছে। আমরা বসে-বসে ছক খেলছি। কথা সবই কানে আসছে। কথাপ্রসঙ্গে ব্যাবসার কথা উঠল। বাঙালির ব্যাবসা প্রসঙ্গ উঠতেই কাকারা কইলেন, "বাঙালির মধ্যে এক অদ্ভুত প্রবণতা শুরু হয়েছে চাকরি করার... বিশেষত চিন-যুদ্ধে কাপড়, রং প্রভৃতি বিশেষ কিছু ব্যাবসায় দারুণ লোকসানের পর বড়বাজারের বহু দোকান খালি হয়ে পড়ে রয়েছে। বাইরে থেকে আসা বিভিন্ন রাজস্থানি সম্প্রদায়ের মানুষ ন্যূনতম ভাড়া নিয়ে দোকান চালু করছেন। অথচ বাঙালি নাকি ব্যবসায় সোনা ফলাত, চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা... "

বাবাঠাকুর চুপচাপ বসে বসে কথা শুনছিলেন। এতক্ষণে কথা বললেন, "বাংলার সঙ্গে ব্যাবসার যে কী ভীষণ যোগাযোগ ছিল, তার প্রমাণ শুধু মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর নয়। সে-কালে বাংলার বিভিন্ন ব্রতকথাতেও বারংবার বাণিজ্যযাত্রার প্রসঙ্গ উঠে আসত।"

গল্পের সন্ধান পেয়ে তিন চারে বারো থামের লোক গুটি-গুটি বাবাঠাকুরকে ঘিরে বসল।

বাবাঠাকুরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি ততক্ষণে কাহিনিতে প্রবেশ করেছেন, "আমাদের চলমান কথায় বাণিজ্যযাত্রা কেন্দ্রিক ব্রতকথার প্রাবল্য লক্ষ করা যায়। ব্রতকথাগুলিতে সুস্থিত বাণিজ্যযাত্রা, সুরক্ষিতভাবে ফিরে আসা প্রভৃতি বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পেতাম, বণিকের পরিবারবর্গ বাড়িতে অধীর

আগ্রহে তার ফিরে আসার অপেক্ষা করছে। বিলম্বের কারণে দারুণ দুর্দশার সম্মুখীন হচ্ছে তার স্ত্রী, একাকিনী মা।

অর্থাৎ, ব্রতকথাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র নীরস কাঠখোট্টা সংস্কার বা বিশ্বাস নয়, বরং অনেকগুলি মানবিক দিক এবং সংসার পরিমণ্ডল, আর্থ-সামাজিক দিক সব ফুটে উঠত।

আজ দুটি কথা বলব— ঘাটকালী ব্রত এবং নাটাইচণ্ডী।

: ঘাটকালী কথা :

এক বণিকপুত্র ও তার অসহায়া বধূর কথা। ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যের মধ্যে তার বিবাহ হয়েছিল। যা চায় সে, সবই ছিল। সুখেই কাটছিল বিবাহিত দিন।

গোল বাঁধল এরপর। প্রভূত ধনসম্পত্তি রেখে বণিক শ্বশুর মারা গেলেন। পুত্রকে পিতার বাণিজ্যের হাল ধরতে হয়, অতএব ডিঙা সাজাতে লাগল বণিকপুত্র। কিন্তু সে-সময় মাৎস্যন্যায়ের সময়। ঘরে নবযৌবনা বধূকে রাখা বড়ো দায়। একা নারী নিরাপদ নয়, ভৃত্যদের বিশ্বাসঘাতক হয়ে ওঠার নিদর্শন গোটা বঙ্গাল জুড়ে।

অনথা নারীকেই বণিক আপনার পুত্রবধূ করে এনেছেন, ফলে পুত্রের শ্বশুরকুলেও কেউ নেই। শেষমেষ আপন মাতুলালয়ে পত্নীকে রেখে আসা স্থির করল বণিকপুত্র। ঝড়-ঝঞ্ঝা হিসাব করে, বছরকালের বাণিজ্যযাত্রার সময় কষে, সেইমতো এক বছর কালের খোরপোশের মূল্য আপন মামা ও মামিকে দিয়ে এল।

মামা ও মামি কিছু বললেন না বটে, কিন্তু সেই কোনকালে তাদের ভগিনী মারা গেছে, সেইসঙ্গে সম্পর্কও ছিন্নপ্রায়। ভাগনার সঙ্গে সম্পর্ক নামমাত্র টিকে ছিল। ফলে এ-দায়িত্ব

ঘাড়ে এসে পড়ায় খুব একটা খুশিও হল না। কিন্তু নিজের মস্ত অবস্থা, সঙ্গে ভাগনা খোরপোশের অর্থও দিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সমাজের ভয়ে না করলেন না। তাই এক বছর কাল বেশ যত্ন-আত্তি করে রাখলেন ভাগনা-বউকে।

বছর গড়িয়ে যায়, বণিকপুত্র আর ব্যাবসা করে ফেরে না। মাস যায়, কাল যায়, বণিকপুত্র আর ফেরে না। একদিকে দুশ্চিন্তায় বধূর রাতে ঘুম হয় না, অন্যদিকে মামিশাশুড়ির অত্যাচার দিন-কে-দিন বাড়তে থাকে।

একটি মানুষের খাওয়ার জোটানো তাঁদের পক্ষে কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু ওই যে, মানুষ সময়ে-সময়ে অকারণে অন্ধ হয়ে পড়ে। তিনি তা-ই হয়ে পড়লেন। চাকরানির যাবতীয় কাজ, সবই তিনি ওই ভাগনা-বধূকে দিয়ে করাতেন।

হতভাগা নারী সবকিছু করেও দিত। তাতেও তাঁর মন বসত না। শেষমেষ একদিন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন।

পথে বেরিয়ে বধূ দেখে আরও সমস্যা! তার ছেঁড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ ভালোভাবে হয় না। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নগরের মানুষজন। 'ধিক' বলে বেরিয়ে পড়ে বধূ। বনেই যাবে সে, যদি তাকে বাঘে খায়, খাক। সেই পশু তবুও ওই নরপশু অপেক্ষা অনেক ভালো।

বধূ বনপ্রান্তে বসে থাকে আর গুমরে গুমরে কাঁদে। রাত হয়, বাড়ে ভয়। সহসা এক কোমলা নারীকণ্ঠ শোনে সে। নরম পাকের মাখা সন্দেশের মতো মিষ্ট স্বরে কেউ বললে, 'বাছা, তুমি ঘাটকালী ব্রত করো। তোমার সকল অমঙ্গল দূর হবে। ব্রতপালনের উপকরণ অতি সামান্য— এক বিড়া পান, সুপুরি, খয়ের, চুন আর সিন্দুর। আর ব্রত শেষে পুকুরপাড়ে ঘাটকালী ঠাকুরানির মাহাত্ম্য বর্ণনা করো। তবে মনে রেখো, তুমি ব্রতকথা শোনার জন্য নারীদের একটি বারই ডাক দেবে।

দ্বিতীয়বার ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই। যে ঘ ইচ্ছায় ব্রতকথা শুনবে, তার কল্যাণ হবে। এই প্রসাদ সবাইকে বিতরণ করবে।'

দৈববাণী শুনে বধূ সকাল হলেই গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামের পথে-পথে ঘোরে, কেউ তাকে এতটুকুও পান-সুপারি দেয় না। তার হাতে তো আর পয়সা নেই। গয়নাগাঁটি যা ছিল তা-ও সব মামাশ্বশুরের ঘরেই খোরপোশের বন্ধকি...

শেষে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে গেরস্থঘরে, যেখানে দুপুরবেলা মেয়েরা ভাত খেয়ে বসে পান চিবুচ্ছে আর ঝিমুচ্ছে, সেখানে ভিক্ষা চায়। কিন্তু ভিখারির নসিবে কেবলই লাঞ্ছনা জোটে; তারও এই ঘর সেই ঘরের লাঞ্ছনা, মুখনাড়া জুটে অবশেষে দু'-চারগাছা পানের ব্যবস্থা হল।

চুন, খয়ের, সুপুরির ব্যবস্থা হল এমনই অনেক মুখনাড়া আর গঞ্জনা সয়ে। সিঁদুরটি অভাগা মেয়েমানুষ নিজের কাছেই রেখেছিল। সেইসব নিয়ে এসে পুকুরঘাটে যাবার আগে ডাক দিয়ে গেল সবাইকে। কিন্তু দু'-চারজন ছাড়া কেউ এল না।

মামাশ্বশুরের ঘর তার আত্মীয়ের ঘর। তাই আলাদা করে মামিশাশুড়িকে ডাক দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি অহংকারে মাটিতে পা ফেলেন না। আর এই বউ তো তাঁর কাঁটা! যাচ্ছেতাই অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন।

ঘাটে দাঁড়িয়ে ঘাটকালী ঠাকুরনের ব্রতকথা পাঠ করে, সেই পান-সুপারি বিলিয়ে দিয়ে আবার ফিরে চলল বণিকবউ।

শ্বশুরঘরের কাছে এসে দেখে, সেখানে তখন বিষম গোল উঠেছে, কান্নার রোল... ঘরের চৌকাঠে পা দিতেই তার শাশুড়ি রে-রে করে তেড়ে এলেন। সবার সামনে 'ডাইনি' বলে অপমান করলেন, বললেন, পুকুরঘাটে পান-সুপারি নিয়ে মন্ত্র পড়ে তুক করে সর্বনাশ করেছে এই বউ!

বধূ সত্যি-সত্যি চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, গোয়ালে গরু মরে পড়ে আছে। খোঁয়াড়ে চমৎকার রাজকীয় রাজহাঁসগুলি মরে পড়ে আছে। গোলায় আগুন জ্বলছে, বালতি-বালতি জল দিয়েও নেভানো যাচ্ছে না। তার মামাশ্বশুর বুকে হাতচাপা দিয়ে উঠানে বসে আছেন।

এই প্রথমবার বউ মুখ খুলল। শাশুড়িকে কড়াভাবেই বললে, 'আপনার নিজের মূর্খামির কারণে এই অবস্থা। আপনি অহংকারের ফল পাচ্ছেন। দেব-দ্বিজের কথা কোনোদিন অবজ্ঞা করতে নেই। আমার মতো করে আপনিও ব্রত পালন করুন। দেখবেন, অবশ্যই আপনি সব ফিরে পাবেন নতুবা আপনার এই অহংকারের ফলে আপনি সর্বস্বান্ত হবেন।'"

নুটুবুড়ো বিজ্ঞের মতো বললেন, "হ্যাঁ, এ বড়ো খারাপ। দখিনপাড়ায় যতের মা-র এমন দেমাক দেখেছিলুম..." আমরা সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠে থামালাম। প্রবৃদ্ধ মানুষটার এই এক সমস্যা, কথার ভেতর কথা পেড়ে, আসল কাহিনির সর্বনাশ করেন।

বাবাঠাকুর বুড়োর হাত ধরে কইলেন, "খুড়ো, শুনব তোমার কথা। এদের এটা কয়ে নিই। তো যেখানে ছিলাম...

মানুষ ঈশ্বরের দোহাই দেয়। কিন্তু আসলে তার কর্মই তার ঘরে সিঁধ কাটে। অহংকার, লোভ হল আপনার ঘরের সিঁধের রাস্তা। আর সিঁধেল চোর হল প্রবৃত্তি।

ওই মামিশাশুড়ির আসলে তা-ই হয়েছিল। ঈশ্বরী শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। আমাদের ব্রতকথাগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে, এমন চমৎকার সমতা দ্বারা নির্মিত হয় এই আখ্যানগুলি অর্থাৎ যাকে বলে কিনা ব্যালেন্সড।

মামিশাশুড়ি ব্রত করে এসে দেখেন সবকিছু আবার পূর্বের মতো হয়ে গেছে! ভাগনা-বউকে সাদরে ঘরের ভিতরে

ডেকে নিয়ে এসে বললেন, 'মা, তুমি সত্যিই সুলক্ষণা, দেবীর আশীর্বাদধন্যা। আমি অন্ধ ছিলাম। আমি ঘাট মানলাম।'

কয়েকদিন যেতে না যেতে নদীঘাটে বড়ো-বড়ো পানসি বজরা দেখা গেল। পতপত করে উড়ছে পায়রার চিহ্নলাঞ্ছিত পতাকা, তার মানে বণিকপুত্র ফিরে আসছে।

গিয়েছিল তিনটি ডিঙি নিয়ে। ফিরে আসছে সার-সার বালাম, পদি, ঘেসো, পটোল, বাজরা নিয়ে।

বধূর আনন্দ আর ধরে না। ছুটে চলে নদীঘাটে। কিন্তু বিধি বাম। মেঘ জমে ছিল বাতাসে। এখন ঘূর্ণি এসে, ঘাটের কাছেই ডুবিয়ে দেয় প্রায়। বণিক-বউ মায়ের কাছে কেঁদে পড়ে, 'মা গো, সব দিয়ে তুমি সব কেন নিয়ে নাও?'

মা তখন দৈববাণী করেন, 'তুমি সব ফিরে পেয়েছ, বাছা। কিন্তু ফিরে পেয়ে তুমি আমার কথাটি ভুলেছ। উচ্ছ্বাসে এমনও ভেসে যেয়ো না যে নিত্যকর্মটি ভুলে যাও। তাহলে কাল কিন্তু তোমায় গ্রাস করবে।'

বউ ক্ষমা চেয়ে হাতজোড় করে পাঁচ বিড়ে পান দিয়ে মায়ের ব্রত করে। ঝড় থামে। ফিরে আসে বণিকপুত্র। আহ্লাদে দিন কাটে তাদের। সেইসঙ্গে সেই ব্রতকথা প্রচলিত হয়।"

এতদূর বলে থেমে আবার কথা বলতে শুরু করলেন বাবাঠাকুর, "দেখো, আমরা এই ব্রতকথাগুলি আমাদের পূর্বপুরুষদের দেওয়া শিক্ষা বলে ধরে নিতে পারি। এখানে সংসারের ভিতরে কোন্দল এবং সে কোন্দল মেটানোর উপায়, ষড়রিপুর প্রতি ভীতি প্রভৃতিকে দর্শিয়ে চমৎকার সমতা গঠন করা হয়েছে। শুধুমাত্র সংস্কার বা কুসংস্কার বলে একে দাগানো যায় না। এ হল বেদের মতো এক শ্রুতিশিক্ষা।

তারই সঙ্গে সে-সময় বাঙালির বাণিজ্যযাত্রা, যাত্রাকালীন সমস্যা, দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি গৃহের সমস্যাগুলির কথা কিন্তু

তুলে ধরা হয়েছে। কাজেই কেবল চাঁদ সদাগর নয়, ব্রতকথা অনেক গভীরে গিয়ে বলে বাঙালি বাণিজ্য করত। দ্বিতীয় কাহিনিটা বলব। সেটা আরও করুণ। তবে, তার আগে আমরা এবারে নুটুখুড়োর গল্প শুনব। তোমরা সবাই বসো।"

একটু থেমে নিয়ে সর্দিজড়ানো ঘড়ঘড়ে স্বরে নুটুখুড়ো বললেন, "এই কাহিনিই তোমাদের জন্মের অনেক আগে। তখন আমরাই অনেক ছোটো।"

কুঁড়েঘর এর মধ্যে যতের মা, মানে ঠাকমাকে দেখতুম সারাদিন শুয়ে শুয়ে কোঁ-কোঁ করছেন আর কাঁদছেন। তার গায়ের পাশ দিয়ে ইঁদুর, তেলাপোকা ঘুরে বেড়াত। কেউ জল দিত না। কুষ্ঠ তাঁর সবটুকু খেয়ে নিয়েছিল। একটা মানুষ মাত্র তিন হাত হয়ে গিয়েছিলেন। এর কারণ কিন্তু সেই অহংকার আর কুকীর্তি।

যতের মা হরধন মুখুটির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। হরধন মুখুটির প্রথম স্ত্রী গত হওয়ার পর নিজের একমাত্র কন্যাকে বুকে ধরে মানুষ করেছিলেন। বিবাহ করেননি। এখন কন্যার বিবাহের পর তিনি একা হয়ে পড়লেন। কে রেঁধে-বেড়ে দেয়?

সবাই বলল কুলীন মানুষ, গরিব ঘরের একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে যদি উদ্ধার করেন, তাতে ভালই হয়। তাইতেই তিনি ঠাকুরমাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর যতে অর্থাৎ যতীন জন্ম নেয়। এর মধ্যে আর একটি কাণ্ড ঘটে। মুখুটিমশাইয়ের কন্যা একটি কন্যাসন্তান জন্ম দিয়ে দেহ রাখে। তার জামাতাও নিরুদ্দেশ হয়। বাড়ির লোকেরা কন্যাটিকে মাতুলালয় তুলে দিয়ে যায়।

যতে আপন ভাগ্নিকে ভীষণ স্নেহ করত। হারাধন ঠাকুরও আপন নাতনিকে ভীষণ স্নেহ করতেন। যতের মা যতের কানে বিষ ঢালার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যতে শোনেনি।

এরপর দিন মেয়েটাকে অপদস্থ করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। তারপর সোনার সোহাগা হল যখন মুখুটিমশাই মারা গেলেন এবং যতেঠাকুর কলিকাতার এক জমিদারবাড়ির মন্দিরে নিত্যসেবার কার্য পেলেন। যতেঠাকুর যা উপার্জন করত তার সবটুকু সে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিত। আশা, তার মা আর ভাগ্নি একটু ভালোভাবে থাকুক। আর এতেই অহংকার বাড়তে থাকল ভদ্রমহিলার। তিনি সংসারের কর্ত্রী। তাঁর পুত্রের উপার্জিত অর্থে সংসার চলে। এই মেয়েকে তিনি কেন সহ্য করবেন। নিজের ভাই ও ভাইয়ের বউকে এনে বসিয়ে মেয়েটির উপরে অকথ্য অত্যাচার চালাতেন।

রাস উৎসবের সময় যতেঠাকুর দীর্ঘ একমাস বাড়িতে আসতে পারত না। জমিদার গৃহের রাসে অনেক ব্যস্ততা থাকত। এইটাকেই কাজে লাগালেন তিনি। মেয়েটিকে জোর করে এক অন্ধ বামুনের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। সেই ব্রাহ্মণের জায়গাজমিও ছিল না। গ্রামের লোকজন চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি তাদের ভয়ানক অপমান করেন বলে শুনেছি। তখন অর্থের দেমাকে তাঁর মাটিতে পা পড়ত না। এমনকি তিনি নাকি তাঁর ছেলেকে বলে কোতোয়াল ডাকার ভয়ও দেখাতেন।

যদিও তাঁর ছেলে এসব কিছুই জানত না।

তারপর আস্তে-আস্তে বুড়ির কুষ্ঠ হল। দৃষ্টিশক্তি গেল। ভাই, ভাইয়ের বউ সবাই ছেড়ে গেল। ছেলে তো আগেই ছেড়ে গিয়েছিল সেইসব শুনে, নামমাত্র অর্থ পাঠাত কেবল মায়ের নামে। আর কোনো সম্পর্কই সে রাখেনি।

শুনলেই তো, কেমনভাবে দেখেছি বুড়িকে, কিন্তু আশ্চর্যের তখনও অনেক বাকি! কীভাবে যেন তার সেই নাতনির কাছে খবর গিয়েছিল।

সেই মেয়ে কুষ্ঠ রোগীটিকে প্রাণ দিয়ে সেবা করে গিয়েছিল শেষ দিন অবধি। বুড়ি সেই মেয়ের কাছে হাউহাউ করে কাঁদত..."

নুটুখুড়োর কণ্ঠার লোল চামড়া কুঁচকে এল উত্তেজনায়, "মরার আগে শ্বাস উঠেছে, নাতনি সবাইকে ডেকে এনেছে। তিনি কেবলই প্রলাপ বকে চলেছেন, 'আমায় ক্ষমা করে দে, মা... তোর পায়ে পড়ি! যমরাজার চর রোজ আসে, এই দ্যাখ, আমার গালে আঁচড়ায়, কিন্তু নিয়ে যায় না। তুই আমাকে একটি বার ক্ষমা কর!'"

চুপ করে গেলেন নুটুখুড়ো। কোথা থেকে যেন ঠান্ডা বাতাস এসে দালানের ভেতর দিয়ে সেঁধিয়ে একরাশ ধুলো উড়িয়ে আমাদের চোখে-নাকে- মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। বাবাঠাকুর কইলেন, "আজকে আশ্বিনের ঝড় হবে... সে বুড়ি বোধহয় আজও মুক্তি পায়নি, খুড়ো। নিজের কথা শুনে এমন করে কেঁদে গেল!"

থমথমে, অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙেছিলেন আমাদের বাবাঠাকুর। বললেন, "নটুখুড়োর কথায় আমার আমার বিশ্বাস আছে। কারণ, আমাদের প্রাচীন বহু ব্রতকথা এমন আছে যেখানে কিনা এমন কথা ফুটে ওঠে। এইভাবেই তো পাপ-পুণ্যের সমতা হয়। এই এখনই আর একটা ব্রতর কথা মনে পড়ে গেল।

সে এক অদ্ভুত ব্রত। সেখানেও এমনই করে ভাইয়েরা নিজের বোনকে গলগ্রহ বিবেচনা করে ফেলে দিয়ে এসেছিল। আর ভাগ্যক্রমে সেই বোনই তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল।"

: এক হতভাগ্য বোনের কথা :

"কোন এককালে কোন এক সওদাগরের কন্যাসন্তানের ভীষণ শখ ছিল। আর এই ইচ্ছাতেই নয় নয় করে সাতটি পুত্রসন্তান জন্মাল। সবশেষে এল তাঁর সেই কন্যারত্ন...

মেয়ে দিনে-দিনে বাড়ে আর বাপ-মায়ের মেয়ের প্রতি স্নেহ চড়চড়িয়ে বাড়ে। ভাইয়েরা জ্বলেপুড়ে মরে আর জ্বলে পুড়ে মরে বউদিদিরা। কিন্তু সে-মেয়ের সুখের দিন একদিন শেষ হল।

বাপ-মা'কে অনেক কাঁদিয়ে সেই মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল। মেয়ের শোক ধরে রাখতে পারলেন না বাবা। মেয়ের বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই ভগ্নশরীরে দেহ রাখলেন। আর ভাইয়েরা দেখল সাপের পাঁচ পা। তাদের তখন পায় কে?

বৃদ্ধা মা কিছু বলতে পারেন না। ভাইয়েরা বোনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করল। বোনের খোঁজখবর নিত না। এইভাবেই দিন যায়, কাল যায়, বছর গড়িয়ে যায়। বণিক-ভাইয়েরা বড়ো বাণিজ্য করার আশায় সাতভাই মিলে সপ্তডিঙা ভাসিয়ে বাণিজ্যে যায়। কিন্তু মাঝসমুদ্রে ওঠে ঝড়। তাদের ডিঙাগুলি হারিয়ে যায়। কোনোমতে একটি ডিঙিতে সাতভাই প্রাণরক্ষা করে ভাসতে-ভাসতে এসে ঠেকে এক সুতি খালে।

সেইখানে নেমে পড়ে তারা। কিন্তু খাবে কী? জল নোনা, চাল, ডাল, তেল, নুন সব ভিজে একসা। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ভাইয়েরা নদীর পাড় ধরে চলতে থাকে। শেষে ঘন জঙ্গলের মাথায় একটি বাড়ি খুঁজে পায়। গৃহের দরজায় করাঘাত করে।

দোর খোলেন গৃহস্বামী। বণিকদের অসহায় অবস্থার কথা শুনে তাদের গৃহে ঠাঁই দেন গরীব গৃহস্বামী। তিনি ও তাঁর ভাই জঙ্গল পেরিয়ে চললেন হাটে— সাতজন অতিথির খাদ্যের ব্যবস্থা

করতে হবে তো। বউকে বলে যান, অতিথিদের কিছু না হোক, অন্তত একটু চিঁড়েগুড় দিয়ে ক্ষুধানিবৃত্তির ব্যবস্থা করতে।

চোখের তলায় কালি, রুগ্‌ণ, অপুষ্ট, শীর্ণ এক গৃহবধূ বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে এসেই অতিথিদের দেখে তার হাত থেকে পড়ে যায় থালা। মাথায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে তাদের।

বণিক-ভাইয়েরা তো অবাক! এ কে! সে হতভাগী 'দাদা' বলে ডাকতেই চমকে ওঠে তারা! ভালো করে ঠাহর করে বুঝতে পারে এ তো তাদের সেই দুলালী বোন!

তারপর তাদের বোনের মুখে সব শুনে আপশোশের শেষ থাকে না। সে-বার তাদের গ্রামে ভয়ানক বন্যা হয়। তাদের অত বড়ো সাতমহলা বাড়ি, জমি সব ভেসে যায়। তারা অপেক্ষা করেছিল বাড়ির মাথায়, জানত তার দাদারা আসবে। অপেক্ষা করতে করতে যখন আর পারেনি, তখন তারা নৌকা নিয়ে সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

পরিবারের অধিকাংশই শেষ হয়ে যায় পথিমধ্যে ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে, অসুস্থতায়। কোনোমতে সে, তার স্বামী ও দুই দেওর এইখানে এসে ঠেকে। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কোনো কাজকর্ম না পেয়ে তার স্বামী এবং দেওররা দস্যুবৃত্তি ধারণ করেছে। দোষের কিছু নেই, তারও স্থির বিশ্বাস ছিল মানুষ বেইমান।

তার স্বামী চিনতে পারেননি। চিনলেও ক্ষমা করবেন বলে মনে হয় না। এই পনেরো বছরে তার দাদারা একটি বারের জন্য তাদের খোঁজ নেয়নি। তাদের অশেষ দুর্গতির জন্য দাদারাও দায়ী। তাই তাদের যথাসর্বস্ব হরণ করে বধ করবেন হয়তো।

দাদাদের পায়ে ধরে নিবেদন করে বোন, তারা যেন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে বেঁধে দেয় চিঁড়েমুড়ি। এতক্ষণে ভাইদের বোধ ফেরে, তারা কী অন্যায়টা না করেছে বোনের

সঙ্গে। তারা শুনেছিল, বোনেদের গ্রাম বন্যায় ভেসে গেছে। কিন্তু সব শুনেও তারা চুপচাপ ছিল, কোনো সাহায্য করতে যায়নি। আর আজ তাদের সেই বোন এত কিছুর পরেও নিজের রক্তের ঋণ পরিশোধ করছে।

বেরিয়ে যাওয়ার পর মেয়েটি তার গৃহে আগুন ধরিয়ে দিল। কারণ, ততক্ষণে ডাকাতদের আসার সময় হয়ে গেছে। তারা যদি তাদের ভাইদের পিছু ধাওয়া করে... আগুন নেভাতে-নেভাতে তার ভাইয়েরা নিশ্চিন্তে ঘাট পেরিয়ে যাবে। ভাইয়েরা নৌকা ছাড়ার সময় সে আগুন দেখে আর অনুতাপের তীব্র দহনে জ্বলেপুড়ে মরে।

এরপর তারা যখন গৃহের ঘাটে গিয়ে পৌঁছাল, তখন তাদের মা কলার পেটো ভাসিয়ে সুয়ো-দুয়ো ব্রত করছে। মা-কে গিয়ে সব খুলে বলল ভাইয়েরা।

মা তৎক্ষণাৎ ছেলেদের সঙ্গে করে গিয়ে মেয়ে-জামাইদের গিয়ে নিয়ে এলেন। কাতর অনুনয় করলেন এই কুকর্ম ছেড়ে দেওয়ার। জামাই বলল, তারা যে পাপের পথে নেমেছে, ক্ষুধা তাদেরকে দিয়ে যে পাপ করিয়েছে, তার থেকে যে মুক্তি নাই!

শাশুড়ি বললেন, 'অনুতাপ যদি সত্য হয়, অর্ধেক পাপ অনুতাপেই জ্বলেপুড়ে দগ্ধ হয়। তবে, পাপের শাস্তি পেতেই হয়। তারপর যতটুকু থাকে তা প্রায়শ্চিত্তের নিষ্ঠায় শেষ হয়।

আজ থেকে তোমরা সুয়ো-দুয়ো ব্রত কর। তার সেবায় নিয়োজিত করো নিজেদের। এই ব্রতে গ্লানি ক্ষয় হয় ও হারানো প্রিয়জন ফিরে আসে। আমি তোমাদের ফিরে পেয়েছি। তাই আজ থেকে এই ব্রত তোমরাও করো।'"

আমার সমস্যাটা কয়ে উঠেছিলাম, "কিন্তু ঠাকুর, ব্রতটার কথাই তো আপনি বলেননি..."

"মস্ত বড়ো এক রাজার দুই পত্নী ছিল। বড়োজনের নাম সুয়ো আর ছোটোজনের নাম দুয়ো। এই সুয়ো আর দুয়ো নাম কিন্তু তাদের পিতৃদত্ত নাম নয়। তাদের স্বভাব তাদের এমনধারা নাম এনে দিয়েছিল। বড়োরানি দারুণ নরম মানুষ, প্রজা থেকে পথশিশু সবার খেয়াল রাখেন; ভৃত্যদের অবধি খেয়াল করেন।

আর ছোটোরানি গৃহে এসেই সবার সঙ্গে হিংসা করেন। প্রজাদের উপর করের বোঝা চাপানোর জন্য রাজার কান ভাঙান। খরার দিনে রাজবাড়ির পুকুরে বেড়া লাগান।

রাজা পুত্রলাভের ইচ্ছায়, বৃদ্ধবয়সে বিয়ে করেছিলেন। তাই কিছু বলতেও পারেন না। ছোটোরানিরও দেমাগ ধরে না।

একপর্যায়ে বড়োজনকে ঘর থেকে বের করে দেন দুয়ো। সুয়োরানি রাজপুরীর বাইরে এক ছোট্ট কুঁড়েতে দিনযাপন করেন। নিজের রান্না-বান্না নিজেই করেন, পাশের একফালি জমিতে নিজেই চাষাবাদ করে, তাই দিয়ে দিন গুজরান করেন। চাকর-বাকর এসে তাঁকে দেখে আর চোখের জল ফেলে। কিন্তু তাদের হাত-পা বাঁধা, ছোটোরানি জানলেই তাদের পিঠে পড়বে বেত্রাঘাত।

এতসব সত্ত্বেও ছোটোরানি ঠিক জানতে পেরে যান। হিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে মরেন— এত কিছুর পরেও বড়োরানিকে এত মানুষ ভালোবাসে! তিনি ঠিক করেন এই সুয়োরানিকে হয় দূর করে দেবেন, নতুবা মেরেই ফেলবেন।

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর রাত, দুর্গাপূজা সমাগত। অসহায় বড়োরানি সারা রাত ধরে কাঁদেন। কাঁদতে কাঁদতেই কখন যেন বড়োরানি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই দেখেন, এক ছোট্ট মেয়ে, লাল টুকটুক কোরা কাপড় পরে,

কানের পাশে পদ্মফুলের কুঁড়ি গুঁজে, চন্দনগন্ধ মেখে তাঁর কাছে এসে বসে। তিনি তখন রান্না করছেন আর চোখের জল ফেলছেন। সে মেয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'মা, তুমি কাঁদ কেন? আমি আসার আগে কেউ যদি এমন করে কাঁদে আমার কি ভালো লাগে? কাল সকালে উঠে তোমার ঘরে যা আছে তাই দিয়ে আমার নৈবেদ্য সাজিয়ো।'

সুয়োরানি বলেন, 'মা, আমার যে ভালো বাসনটুকুও নেই। কীসে খেতে দেব?'

'আহা, তাতে কী! মানপাতায় ভাত বেড়ে দিয়ো, মানপাতায় গয়না এঁকে দিয়ো; তাহলেই দেখবে মানপাতা সোনার থালা হয়ে যাবে, তাতেই আমি খাব। তারপর তোমার কাছে আসব, থাকব। সব দুঃখ দূর করে দেব, দেখো। এবারে আসি, মা। আর, কাল মা দুর্গাকে ভক্তিভরে ডেকো কিন্তু... '

সকাল হয়। বাইরে বেরিয়ে এসে সুয়োরানি দেখেন তাঁর বাড়ির পাশের শিউলি গাছটা থেকে ফুল পড়ে বিছিয়ে আছে। তিনি কোঁচড় ভরে ফুল নিয়ে পুকুর থেকে ধুয়ে আনেন। তারপর দুটি মানপাতা কেটে ভক্তিভরে ঘি আর পিটুলি দিয়ে তাতে গয়না আঁকেন। তারপর তাতে আতপান্ন বেড়ে দিয়ে, মনে মনে মা-কে বলেন, 'এই নাও মা, এই অভাগী সোনার থালায় ভাত দিল।' তারপর সেই প্রসাদ খেয়ে দুটি পাতাকে পুকুরের জলে ভাসিয়ে দিলেন। এমন করে প্রতি বছর আশ্বিনের চতুর্থীতে সুয়োরানি ব্রত করে চলেন। মনের আশা আর পূর্ণ হয় না।

একসময় তাঁর মনের সবটুকু আশা তিরোহিত হল। কেবলমাত্র ঈশ্বরচিন্তা রইল। ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় তিনি ঈশ্বরের সেবা করে চললেন। তাঁর আর চাওয়ার কিছু নেই। শুধু ইষ্টের সেবাই তাঁর ধর্ম।

আর সেই বছর থেকে এই রাজ্যে শুরু হল অশান্তি। দিকে-দিকে হাহাকার উঠল। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর প্রজার দল রাজার কাছে এসে আছড়ে পড়ল। এতদিন প্রজারা মুখ বুজে ছিল, এবারে তারা বলল, 'এই অলক্ষ্মী দুয়োরানির জন্য সব কিছু হয়েছে। আজ চতুর্থী রাত পোহালে দুর্গাপুজো, মা পূজা নেন কি না সন্দেহ!'

দুশ্চিন্তায় রাজা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে একাই চলতে থাকেন। ঠিক সেই সময় ভক্তিভরে মায়ের ব্রত ও পূজা সেরে মানপাতা ভাসিয়ে আসছিলেন সুয়োরানি।

সুয়োরানিকে দেখে তিনি যেন তড়িদাহত হলেন। এ কী চেহারা হয়েছে তাঁর! রানি যেন তার রাজ্যের শ্রী... দুর্ভিক্ষ, অনাহারে তাঁর রাজ্যের চেহারাও তো এমনই। সুয়োরানি রাজাকে প্রণাম করলেন। রাজা তাঁকে রাজবাড়িতে নিয়ে এলেন।

রানি নগরীর চৌকাঠে পা দেওয়ামাত্র আকাশ কালো করে বৃষ্টি এল। সেই অসময়ে চাষিরা ফসল বোনার তোড়জোড় করতে লাগল। দুর্গাপূজার শেষে ফসল বোনা হল। সেই অসময়ে জমির বুক উপচে সোনালি ফসল ফলল। রাজা সব বুঝলেন। সুয়োরানিও মায়ের মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করলেন।

দুয়োরানিকে সবাই মিলে একঘরে করে দিল। রাজাও তাঁর মুখ দেখা বন্ধ করলেন। তবে, সুয়োরানির হস্তক্ষেপে দুয়োরানিকে প্রাসাদ ছাড়তে হল না। সেই থেকে সুয়ো-দুয়ো ব্রত চিরায়ত হল। ব্রত করলে প্রিয়জন ঘরে ফিরে আসে, সৌভাগ্য ফিরে আসে, তাই এ-ব্রত শাশ্বত হল 'সৌভাগ্য চতুর্থী ব্রত' নামে। রানি মানপাতায় সোনার গহনা এঁকে তাতে মা-কে ভোগ নিবেদন করেছিলেন, তাই এই পুজোর প্রকরণ অমনই স্থির রইল। আতপ চাল, ঘি, দুধে পরমান্ন রেঁধে মানপাতায় ঘি আর পিটুলি দিয়ে সোনার গহনা এঁকে মা-কে পূজা দিয়েই সারা হয় আশ্বিন মাসের সুয়ো-দুয়ো চতুর্থী ব্রত।"

।। সন্তোষী মা - বাঙালির চাকরি-যাত্রা ।।

"অনেকক্ষণ ধরে এই মাছিটা ভোঁ-ভোঁ করে উঠছিল।। এবার গুড়ে এসে বসল। পিছনের ব্রতিনী মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গেই কাপড় পাকিয়ে মারতে গেল। ঠাকুরের নৈবেদ্য এঁটো করা!

সাবিত্রী বাধা দিল। এই মাছি কোনো সাধারণ মাছি হতে পারে না। সাধারণ মাছির গায়ে এমন উজ্জ্বল, জোনাকপোকার মতো আভা হয় না। অন্যান্য ব্রতিনীদের চোখে তা পড়েনি। তারা বলল, 'তুমি উপোস করে আছ, তাই চোখে ভুল দেখছ।' কিন্তু সাবিত্রীর স্থির বিশ্বাস ছিল, মা এই মাছির বেশেই তার কাছে এসেছেন..."

আজকে আমরা বাবাঠাকুরকে বাসরাস্তায় পেড়ে বসে ছিলাম। সেদিন যে উনি বলেছিলেন, বাঙালি ব্যাবসায় দড় ছিল আর সেই নিয়ে মঙ্গলকাব্য থেকে ব্রতকথার অজস্র কাহিনি!

"তাহলে আমাদের এই চাকুরি করা— এইটে কবে থেকে চালু হল, তার কোনো প্রমাণ আছে নাকি?"

বাবাঠাকুর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হেসে বলেছিলেন, "অন্য একদিন বলব।"

আজকের বাদা থেকে কড়াই তুলে ফেরার সময় দেখলাম বাবাঠাকুর পথ দিয়ে হেঁটে-হেঁটে চলেছেন। পাশের গ্রামে যাবেন। বিকেলবেলা মৃদুমন্দ বাতাস আসছে খালপাড় থেকে, মাথায় বোঝা নিয়ে রাস্তায় হোঁচট খাচ্ছি, কিন্তু সে-সব চিন্তা করার সময় ছিল না। রইল কড়াইয়ের মোট, রইল মা-ঠাকুমার বকুনির ভয়, বাবাঠাকুরকে আমরা সবাই চেপে

ধরলুম। খেজুরগাছের পাতার ফাঁক বেয়ে আসা চিড়চিড়ে হাওয়ায় কেঁপে উঠল তাঁর স্বর, বললেন, "তোমাদের রামুর গল্প করব। রামুর চাকরি করার গল্প কীভাবে ব্রতকথা সঙ্গে জুড়ে গেল এবং পরবর্তী সময়ের বাংলায় কীভাবে চাকরির ফসল আসছে। অন্যদিকে সংসার ভাঙছে, একান্নবর্তী হতে একবর্তী হচ্ছে তার ছবি তোমাদের দেখাব।"

: সন্তোষী মা ব্রত :

"এক গ্রামে এক বণিক বসবাস করতেন। বণিকের অবস্থা যথেষ্ট ভালো। তিনি সবকিছু স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত রেখে স্বর্গে গিয়েছিলেন। বণিকের ছয় পুত্র তখন যথেষ্ট বড়ো এবং সাবালক। তারা নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে নিল, কিন্তু নাবালক ছোটোভাইটিকে কিছুই দিল না। বাবা থাকতে-থাকতেই তাদের বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন। বিবাহের যৌতুক আর বাবার সম্পত্তি মিলিয়ে সবাই ভালোমতো দাঁড়িয়ে গেল।

ছোটোপুত্র রামু যখন বড়ো হল, তখন তার জন্য কিছুই নেই। সে কিন্তু তা নিয়ে দুঃখ করত না। সে জানত তার মা এখনও বেঁচে আছেন। আর তার দাদা-বউদিরা তার কাছে অভিভাবকেরই সমান, তারা কখনোই তাকে ঠকাবে না। রামু যখন একা ছিল, তা-ও ছিল একপ্রকার— দাদা-বউদির উচ্ছিষ্ট তার মা তুলে রাখতেন। আর রামু সেই খেয়ে মনে করত যে দাদা-বউদিরা তাকে মাংস-মন্ডা খেতে দিচ্ছে।"

কাসেম অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "মা আবার এমন হয় নাকি!"

বাবাঠাকুরের হেসে কইলেন, "হয় বাছা, হয়। মায়ের যখন কোনো পথ থাকে না, ছেলেদের উপরে নির্ভরশীল হতে হয়, তখন তিনিও খানিক পক্ষপাতিত্ব করতে বাধ্য হন।

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি ছেলের জন্য বউ আনলেন। ছেলের নিজের ভাগ্য তো খুবই খারাপ, যদি পত্নীভাগ্যে কিছু সুরাহ হয়! বউমা সাবিত্রী এসে দেখল সংসারে বিশবাঁও জল। তার বাপের বাড়ির অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে সে কোনো মর্যাদা পেল না। বেকার স্বামীর পত্নীর অবস্থা কী-ই বা ভালো হয়! সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি— বাসন মাজা, ঘর মোছা, কুটনো কাটা এমনকি জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনা পর্যন্ত সেই নতুন বউকে করতে হত।

প্রথম-প্রথম রামু কিছুই বুঝতে পারত না। কারণ, তার কাছে সাবিত্রী কোনোদিন এ-সব নিয়ে অভিযোগ করেনি। কিন্তু দিন-দিন মেয়েটির শরীর শুকিয়ে যেতে লাগল। রামু বুঝতে পারল না যে, কেন এমন দশা! তার দাদা-বউদি, তার মা তো তাকে যথেষ্ট আদর-যত্নেই রাখেন বলে সে জানে! তাহলে এমন কেন!

একদিন মাঠ থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে ফিরে এসে সবই দেখল সে। তার পত্নী সবাই খেয়ে যাওয়ার পর প্রায় অভুক্তই থেকে যায়। সবাই যখন ঘুমায়, তার বউ দুপুরে কাঠ কাটতে যায়। এতটুকু বিশ্রামও হয় না তার। তার দাদারা তাকে এতদিন বলে এসেছে, সে কাজ করলে, খেত-খামার কে দেখবে? এগুলো তার দায়িত্বে সুরক্ষিত। আর সে-ও বোকার মতো বিনা অর্থে শ্রম দিয়ে এসেছে। আর তার বদলে এই প্রতিদান! রাগে-দুঃখে, ক্ষোভে-অপমানে সে সেদিন উপবাসী রইল। তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করতেও এলেন না। প্রচণ্ড ক্ষুধায় তার পত্নী জ্ঞান হারালে, রান্নাঘরে জলের বেশি কিছুই মিলল না।

সেদিনই রামুর সিদ্ধান্ত নিল, এ-ঘর সে পরিত্যাগ করবে। স্বামী হয়ে যদি পত্নীর জন্য এতটুকু সুখ, সম্মান না আনতে পারে তাহলে এই জীবন রাখার থেকে না রাখাই ভালো। তবে না-

রাখার চিন্তা রামু করল না, বরং সে জেদ ধরে বসল যেভাবেই হোক তার স্ত্রীকে তার যোগ্য সম্মান সে পাইয়ে দেবে।

পরদিন স্ত্রীর কাছে অনুমতি নিয়ে রামু যাত্রা করল। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম ভেঙে সে শহরে গিয়ে পৌঁছাল। শহরের বাজারে এক মনিহারি দোকানে কাজ নিল।

নামমাত্র মাহিনা আর খেতে-পরতে দেওয়ার চুক্তিতে এসে কাজ জুটেছে। এদিকে দিন যায়, কাল যায়, মাস যায় আর রামু সবটুকু শ্রম দিয়ে কাজ করতে থাকে। অন্যদিকে বউয়ের অবস্থা দিন-কে-দিন আরও খারাপ হতে থাকে। শরীর নাড়াতে পারে না।

একদিন বনে কাঠ কাটতে গিয়ে সাবিত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বনের মধ্যে কয়েকজন নারী তার চোখে-মুখে জল দিয়ে তার জ্ঞান ফেরায়। জ্ঞান ফিরলে সে দেখতে পায় তারা তাকে একটা মন্দিরে চাতালে শুইয়েছে। অভাগী সাবিত্রী জানতে চায়, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী মায়ের কথা সেই নারীদের কাছে, কেঁদে বলে তার সব দুঃখের কথা। সেই নারীরা বলে, আজ তারা উপোস করে সন্তোষী মায়ের কাছে এসেছে। সংসারের অশান্তি, জ্বালা-যন্ত্রণার কথা সন্তোষী মায়ের কাছেই উজাড় করে দিলে, মা তাদের পথ দেখান।

সাবিত্রী তাদের কাছে কেঁদে পড়ে, সে-ও ব্রত করতে চায়— যদি মা তার দিকে একটি বার মুখ তুলে চান। ভাগ্যের পরিহাসে সাবিত্রী দুই দিন ধরেই উপবাসী। মেয়েরা তৎক্ষণাৎ সাবিত্রির হাতে গুড়-জল দিয়ে তাদের সঙ্গে পূজায় বসায়।

দেবীর ব্রতকথা শুনে জয়ধ্বনি দিয়ে সাবিত্রী বাড়ি আসে। সেই নারীরা বারবার তাকে সাবধান করে দেয়, টক জাতীয় কিছু না খেতে, পূজার দিনে টক খাওয়া বারণ।

সাবিত্রী বাড়ি ফিরে আসে। আর ওইদিনই আর এক কাণ্ড ঘটে যায়। রামুর মালিক রামুকে ডেকে তার মাহিনে বাড়িয়ে

দ্বিশতাধিক করে দেন। আজ রামুর জন্যেই তার দোকানের এত নাম-যশ! সাত বছর আগে তার দোকান ছিল শহরের সামান্য একটি দোকান... আর আজ রামুর কর্মনিষ্ঠায় সেই দোকান রাজধানী থেকে মানুষজন ডেকে আনে। তিনি রামুকে তার দোকানের শ্রেষ্ঠ কর্মচারী হিসেবে দোকানের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার ঘাড়েই অর্পণ করলেন।

সুখের চিন্তায় গদগদ হয়ে রামু রাত্রে ঘুমোতে গেল। সে রাত্রেই স্বপ্নে এলেন মা। রামু ঈশ্বরী সন্তোষী মা-কে কখনও দেখেনি, কিন্তু তাঁর সে ঐশীভাব তার সুষুপ্তিমগ্ন চেতনাকেও আচ্ছন্ন করল।

বহুদিন পর তার ঘরের ফেলে আসা স্ত্রী, মা, দাদা, বউদি সবার কথা মনে পড়ল। মায়ের মায়াভরা মুখখানি দেখে রামু স্বপ্নের মধ্যেই কেঁদে ফেললে।

মা রামুর মাথায় হাত বোলাতে বললেন, 'কেন বাবা ভিনদেশে পড়ে আছিস? তোর স্ত্রী বড়ো কষ্টে আছে। সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। আমি তার কথা না শুনে থাকতে পারি না। তোর পদোন্নতি হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত সবই এখন তোর হাতের মুঠোয়, এবার পরিবারকে একটু দেখ। সে যে আমার একনিষ্ঠ ভক্ত! তুই কেবল কাল জয় মা সন্তোষী বলে দোকান খুলবি, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

রাম ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে, চিন্তায় থাকে। কীভাবে সে যাত্রা করবে? একদিকে পত্নীচিন্তা, মায়ের আদেশ আর অন্যদিকে দোকানে প্রচুর অর্থের মাল মজুত করা হয়েছে। এই অবস্থায় তার ছুটির প্রার্থনা করা বড়োই দৃষ্টিকটু।

মনে-মনে মা-কে স্মরণ করে সকালে স্নান সেরে মায়ের রূপকল্পনা করে ধূপ-বাতির অর্ঘ্য নিবেদন করে রামু 'জয় মা' বলে দোকানের খাতা খুলল। আর খুলতেই বিস্ময় লেগে গেল! সার-সার লোকের ভিড়! তাদের গুদামের সমস্ত মাল শেষ

হয়ে গেল! খরিদ্দার ফাঁকা হাতে ফিরে যেতে লাগল। মালিক বললেন, 'সমস্ত মাল আজ শেষ হয়ে গেছে। হেনকালে নতুন করে দ্রব্য আনতে কয়েকদিন সময় লাগবে। এই কয়দিন দোকান বন্ধ থাকাই শ্রেয়। খরিদ্দার হলেন লক্ষ্মী, তাদের ফিরিয়ে দিতে ভালো লাগে না।' এই সুযোগে রামু কথাটি পেড়ে ফেলল, সে বাড়ি ঘুরে আসতে চায়।

মালিক তাকে ছেড়ে দিলে রামু ঘরে চলল। তবে সে এসেছিল হেঁটে, এবারে গেল ঘোড়ায় চড়ে।

সাবিত্রী এত কিছু জানত না। কাঠ কাটতে এসে মায়ের মন্দিরে কেঁদে বলল, 'মা গো আর কতদিন?'

সহসা দৈববাণী হল, 'তোর দুঃখের দিন গেছে। তোর স্বামী ফিরে আসছে। তোর সংগ্রহের তিনবোঝা কাঠ আজ বাড়ির উঠোনে রাখবি, নদীর তীরে রাখবি আর জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রাখবি। বাড়ি গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে আদেশের মতো করে খাবার দিতে বলবি। আর বলবি, এই কাঠ তোমরা গিয়ে তুলে আনো। বাকি নিশ্চিন্ত থাক।'

কাঠ কাঁধে ঘরে ফেরার সময় সাবিত্রী দেখল ঘোড়ায় চড়ে এক যুবক আসছ। সে দেখামাত্রই স্বামীকে চিনেছে, তাই নিজেকে আড়াল করে নিল। এই অভাগীর দশায় স্বামীর সামনে যেতে তার বড়ো লজ্জা করল।

যা-ই হোক, ঘরে ফিরে দেখেন ঘরের বাইরে ঘোড়া রাখা আছে। ভিতর থেকে শুনতে পেল তার শাশুড়িমা গদগদ হয়ে তার স্বামীর যত্ন করছেন। তার জায়েদের আদিখ্যেতাও ভালোই শুনতে পেলেন। শ্রীশ্রী সন্তোষী মায়ের কথামতো উচ্চস্বরে খাবার দেওয়ার আদেশ করল সে। তার শাশুড়িমা বেরিয়ে এসে অপ্রস্তুত দশায় পড়ে গেলেন। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে রামু বেরিয়ে এসেছিল। বউয়ের পোশাক দেখে সে যা বোঝার

সবই বুঝে গিয়েছিল। এতক্ষণ রামুর মা ছেলের কাছে বউমার সম্বন্ধে নানা কথা বলছিলেন; ভেবেছিলেন বউমা এলে পিছনের দোর দিয়ে ঢুকিয়ে, তাকে ভালো করে সাজপোশাক করিয়ে, শিখিয়ে-পড়িয়ে দেবেন। এখন সব প্রমাণিত হয়ে গেল।

রামু রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, দু'গাছা ভুষির রুটি পড়ে আছে। রামু বলল, 'সংসারের সব কাজ করার পরে আমার স্ত্রীর জন্য ভুষির রুটি!'

জুয়াচুরি ধরা পড়ে গেলে, গ্রামের সামনে মান নষ্ট হওয়ার ভয়ে সবাই করজোড়ে মাফ চেয়ে তাদেরকে ঘরে তুলে নিলেন।"

আমরা উশখুশ করছিলাম উঠে পড়ার জন্য, কারণ, কাহিনি তো শেষ, উপসংহারের কী প্রয়োজন! বাবাঠাকুর হাত দিয়ে আমাদের বসালেন, "তোমরা বড়োই অধীর। এই বয়সে এত অধৈর্য হলে চলবে কী করে! এখনও বিস্তর বাকি।

রামু এবং রামুর স্ত্রী সাবিত্রী মায়ের মন্দিরে যায় এবং ভক্তিভরে মায়ের পূজা দেয়। তারা চিন্তা করল মায়ের মন্দির স্থাপন করে বাৎসরিক পূজা করবে। বাৎসরিক পূজার দিনক্ষণ স্থির হল। মায়ের প্রসাদ গরুদের খাইয়ে, ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে, বালকভোজন করানোর নিয়ম। এখন বালক আর কোথায় পায়, রামু তাই নিজগৃহের ভাইপো-ভাইঝিদের ভোজন করানোর সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু তাদের মায়েরা ভারি খল। ফন্দি করে ছেলেদের বলল, তারা যেন টক খেতে চায়।

খাওয়ার সময় সেই সকল শিশুরা এমন নাছোড়বান্দার মতো বেঁকে বসল যে বাধ্য হয়ে তাদের হাতে টাকা দিল রামু। মায়ের পূজায় টক নিষিদ্ধ। তাই সরাসরি টক খাওয়ানো যাবে না। টাকা নিয়ে তারা বরং কিনে নিক।

খাওয়া শেষ হল কি হল না, কোতোয়ালি থেকে শমন এল। রামুকে একবার কোতোয়ালে যেতে হবে। দোকানে

কী একটা সমস্যা হয়েছে। রামু ছুটল। এদিকে বউদিদিরা মহানন্দে ঘরে ঢুকে হাততালি দিতে লাগল।

সাবিত্রী আলুথালু বেশে কেঁদে পড়লে মায়ের কাছে, মা বললেন, 'নিজেকে অটল রাখবি, নতুবা তোরা আবার এইভাবেই প্রতারিত হবি। এ হল শিক্ষা। প্রিয়জন মাত্রেই শুভাকাঙ্ক্ষী নয়। প্রয়োজনে কঠোর হতে শেখ। তোর স্বামী আজকেই ফিরে আসবে।'

রামু সন্ধ্যায় হাসিখুশি ফিরে এল। কোতোয়ালিতে তার এক বিশেষ বন্ধু বদলি হয়ে এসেছে। তাই সে তাকে দেখতে চেয়ে খবর পাঠিয়েছিল। দাদা-বউদিরা প্রমাদ গুনল। রামুর এখন পরিচয়ের বৃত্তটাও অনেক বড়ো।

আগের দিন পূজা সমাপন হয়নি, তাই আবার পূজা সমাপ্ত করার জন্য ব্যবস্থা করল রামু। সেই শিশুগুলো আবার টক খেতে চাইলে, সাবিত্রী কড়া ধমক দিয়ে বসিয়ে ভোগ খাওয়াল। আর মা সন্তোষী এর সবই এসে দেখলেন মাছি হয়ে। তিনি মাছি হয়ে তার ভক্তের গুড়-জলের প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

দেখলে তো ভাই, এভাবেই আমাদের বাঙালির পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। আগে যেখানে ভাইয়েরা মিলিয়ে-মিশিয়ে চলত, একজনের কাঁধ আর একজন শক্ত করে ধরত, সেখানে ভাগাভাগি এল; ভাইদের ঠকানো শুরু হল। নিজের জমিতে শ্রম দিয়েও উপযুক্ত ফল না পেয়ে, শহরমুখী হল এবং কর্মে নিজের সার্থকতা খুঁজে পাওয়ার সে-ই তো শুরু।

রামু এতদিন যে বিশ্বাস ও আনুগত্য দাদাদের দিয়েছিল, সেটাই জমা করল মালিকের কাছে। সে জানত তার আর অন্য কলা, বাণিজ্য জানা নেই তদুপরি দীর্ঘদিন গৃহে থেকে সে স্থির নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছিল। তাই বেতন বিনিময়ে চাকরির নিশ্চিন্ততাই তার জন্য শ্রেয়।

।। শুভ দুর্গা, বাল দুর্গা ।।

"পরিব্রাজক হয়ে একের পর এক ঘুরে গেছি। আমার এই পরিব্রাজন কর্মসূত্রে অথচ কীভাবে যেন মা এসে আমার হাত ধরলেন। ফলে কর্মের যে ভ্রমণটি হয়েছে সেটি যেন সেই মায়ের হাত ধরে মেলা দেখতে যাওয়ার মতো। যেখানেই ঘুরেছি, আমার আঙুল মায়ের হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল।

সেই মুঠোর ভিজে গন্ধ, স্পর্শ আমি প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তে উপলব্ধি করেছি।

আর যত উপকথা সংগ্রহ করে তোমাদের কাছে এনে দিয়েছি তাতে মিশে আছে লৌকিক উপলব্ধি। এরাই আমাকে ভীষণভাবে জড়িয়ে নিয়েছিল।

আজ তোমাদের যে কাহিনি বলব, সে কাহিনিতে মা খুব সাধারণভাবে আমাদের সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছেন। মা হয়ে তিনি আর পাঁচজন সাধারণের মধ্যে এসেছেন। যেমনভাবে মা বনদুর্গা, মায়ের সন্তান হয়েও মাটির মানুষ, ঠিক তেমন করে। কোথাও মাতৃবিশ্বাস এতই প্রবল যে, আমরা একটি পুরুষকে মাতৃকারূপে ধরে নিচ্ছি। মা একটা বিশাল বিপুল বোধ, যে বোধে পুরুষ, নারী, সম্প্রদায়, জাতি, পশু, প্রাণী কোনো ভেদ থাকে না।"

"কিন্তু জ্যাঠাবাবু, আপনি যেমন বলছিলেন, লৌকিক দুর্গা ও পৌরাণিক মা চণ্ডীর মধ্যে পার্থক্য কী? আমরা কেন এইভাবে তাঁকে দেখছি? কোনো বিশেষ কারণ?"

আজ চণ্ডীমণ্ডপে ভবখুড়োও উপস্থিত ছিলেন। খুড়োমশাই বিদ্বান মানুষ। আমাদের নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়টির প্রধান

শিক্ষকও বটে। অন্যদিন উপস্থিত থাকেন না। কিন্তু আজ বিশেষ কারণবশত একটি শরিকি মীমাংসার কারণে পঞ্চায়েতের ডাকে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আর বাবাঠাকুরের এই মাতৃ-প্রসঙ্গটি সেখানে যে কীভাবে উঠেছিল, তা-ও আমরা মনে করতে পারি না। আমাদের আসতে দেওয়া হয়নি এতক্ষণ, কিন্তু আজকের মতো এত উতলা আমরা বাবাঠাকুরকে দেখিনি। আমরা নেহাতই বালক, আমাদের কেউ সমুখে যেতে দেয় না; নাহলে, বুদন বাবাঠাকুরের কোলে উঠে বসে পড়ত। দেখতুম তিনি এমন করে উতলা থাকতেন কী করে।

বাবাঠাকুর, মানে আমাদের দাদু কথা বলা শুরু করলেন। ভীষণ বিষাদ আর মায়া নিয়ে সে-কথা ধাক্কা মারল যেন আটচালার খুঁটিতে-খুঁটিতে, নাড়িয়ে দিল আড়কাঠখানা। বড়ো ভারি কথা...

"চট্টগ্রাম হতে সোঁদরবন ঘুরতে-ঘুরতে মায়ের অনেক ছবি আমি দেখেছি। তাই উত্তরটাও খুঁজেছি নিজের মতন। সেটাই বলি।"

: প্রাককথন :

"এই প্রসঙ্গে খুব স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন আসে, পৌরাণিক দুর্গার সঙ্গে মা চণ্ডীর আলগা সুতো থাকলেও তাঁদেরকে লৌকিক দুর্গা বলে অভিহিত করা হচ্ছে কেন? লৌকিক দুর্গা আবার কী বিষয়?

এই মাটির আদিম বাসিন্দাদের সঙ্গে দিনযাপন করে দেখেছি, এই বঙ্গজ প্রাচীন সংস্কৃতিতে লৌকিক দেবদেবীরা তাদের ঐশী, দৈবী সংযোগ ছাড়াই মানুষের দেবতা বা লোকেশ্বর হয়ে যুগ-যুগ ধরে রয়ে গেছেন।

মানুষের মনে স্থির নির্দিষ্ট বিশ্বাস ছিল— হারালে পায়, ম'লে জিওয়, নিধনের ধন হয়, অপুত্রার পুত্র হয়, খাঁড়ায় কাটে না, আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, কাটা মাথায় জোড়া লয়, সতীন মরে ঘর হয়, রাজা মরে রাজ্য পায়।

যেমন, প্রত্যন্ত আদিবাসী সমাজে ওঁরাও শিকার-দেবী চাণ্ডী প্রায় মা চণ্ডীরই সমতুল।

পৌরাণিক ধর্মগুলি যখন ধীরে-ধীরে প্রতিষ্ঠা পেতে লাগল, পৌরাণিক মতবাদগুলি যখন ধীরে-ধীরে ভারী হয়ে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল, তখন পৌরাণিক এবং লৌকিকের মধ্যে একটা অদৃশ্য সমঝোতা তৈরি হয়ে গেল। মানুষের মনের ভেতরেই অনেক লৌকিক দেবদেবী পৌরাণিকত্বের আড়ালে নিজেদেরকে লুকিয়ে এক হয়ে গেলেন। আবার, অনেক পৌরাণিক ধারণা অবস্থাপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা লৌকিকের সঙ্গে মিলেমিশে গেল। বিভিন্ন লৌকিক দুর্গা দেবী চণ্ডিকা, দেবী সিংহবাহিনী, দেবী গণেশজননী। তাঁরা ভাবনায় শিব-দুর্গার সহিত এক; আবার কখনও কর্মে, ব্রত যাপনে ভিন্ন।

'মা দুর্গা' নামটি মঙ্গলদায়িনী, রণে সহায়িকা শক্তি হিসাবে বাঙালির মননের গভীরে গেঁথে গিয়েছে।"

"কিছু কথা বলুন, জ্যাঠাবাবু। আপনাকে জানতে বড়ো ভালো লাগে।" মাস্টারমশাই, মানে ভবখুড়ো আবারও বললেন বাবাঠাকুরকে।

"এই মিশে যাওয়ার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ হল, মা শুভদুর্গার পূজা। মা শুভদুর্গাকে মায়ের একটি লৌকিক রূপ হিসাবে ধরা হয়। মা শুভদুর্গা অতি সামান্যেই তুষ্ট। যে-কোনো দিন, যে-কোনো মাস বা শুভতিথির দিবাভাগে স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন গাত্রে, শুদ্ধ মনে একটি মাটির সরায় বা কলাপাতায় দুধ, কলা আর চালের নৈবেদ্য সাজিয়ে মা-কে একমনে স্তব করলেই মা এসে ভক্তের কল্যাণ করেন বলেই বিশ্বাস।

আমরা পৌরাণিক মতে দেবীর পূজা করে যারা অভ্যস্ত, তারা দুর্গা নামটি শুনেই বলব, 'যাহ্, এমন আবার হয় নাকি! মায়ের পূজার কোনো নির্দিষ্ট দিন-তিথি নেই!'

কিন্তু মায়ের ব্রতকথাটিই যে এমন— বিপদের দিনে চরম আকুল হয়ে মাকে ডাকলেই তিনি সাড়া দেন। তার জন্য দিন বা তিথি নেই। বিপদে পড়লে তাঁকে ডেকো।"

: মা শুভদুর্গার কথা :

"সে এক সময়। সে-সময়ে মস্ত সব রাজা-রাজড়াদের বাস। গরিব বিধবা এক ব্রাহ্মণী নিজ সন্তানকে নিয়ে অতিকষ্টে সুতো কেটে দিন অতিবাহিত করেন। সন্তানটির বৃদ্ধিকাল; সে তার বন্ধুবান্ধবদের দেখে আর বিবিধ ভালোমন্দ, মাছ-মাংস খাওয়ার লোভ করে। কিন্তু তাদের এমনই অবস্থা যে, শাকপাতা জোগাড় করতেই দিন সাঙ্গ হয়।

একদিন ছেলে ব্রাহ্মণীর কাছে কেঁদে পড়ল। ব্রাহ্মণীর অত পয়সা কোথায়? অনেক কষ্টে এক মেছুনিকে এই শর্তে রাজি করালেন যে, মাছের ঝোলটি রাঁধা হয়ে গেলেই সেই ঝোলটি তুলে রেখে ভাজা মাছটি দিয়ে দেবেন। যেমন কথা তেমন কাজ। দুপুরবেলা খেতে বসে সেই স্বাদ গ্রহণ করে, ছেলে তো আরও লালায়িত হয়ে পড়ল।

না জানি মাছের স্বাদ কেমন হবে?

কিন্তু ওই যে কথায় বলে, লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু। তা-ই হল।

একদিন রাজার হাঁসগুলি যখন চরতে বেরিয়েছে, একটি হাঁসকে হত্যা করে ছেলেটি তার মাংস খেলে। এদিকে সেই দৃশ্য ধরা পড়ল রাজার এক বিশ্বস্ত কর্মচারীর চোখে।

রক্ষীর দল ছেলেকে নিয়ে হাজির করল রাজার সম্মুখে। এমন ভীষণ পাপের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

ব্রাহ্মণীর কাছে খবর যাওয়ামাত্র ব্রাহ্মণী আকুল হয়ে কেঁদে পড়লেন। সেই ভরদুপুরে আলুথালু বেশে ঘরের কোণে মা শুভদুর্গার নামটি করতে বসলেন।

একদিকে ব্রাহ্মণী মা দুর্গার নাম করেন, অন্যদিকে গ্রামের পথে নড়ি হাতে, জটাধারী বৃদ্ধা বাহির হন ভিক্ষায়। ভিক্ষা করতে-করতে তিনি এসে হাজির হন সেই হাঁসের পালকের কাছে। পথের থেকে দুর্বাঘাস তুলে, পুকুরের জল নিয়ে ছড়া দিতেই সে হাঁস জীবিত হয়ে যায় (পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণী ব্রতের দূর্বা-জল ছড়া দেন)।

রাজার কাছে ১০৮টি হাঁসের সংখ্যাটি ঠিক থাকায়, সেই ছেলেটিও নির্দোষ প্রমাণ পেয়ে ছাড়া পেয়ে যায়। উপরন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণকে পীড়া দেবার জন্য মার্জনা হিসাবে, রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব দেন রাজা।

সব নিয়ে জাঁকজমক করে বাড়ি ফিরে, ব্রাহ্মণীর কাছে সন্তান এসে শোনে মা শুভদুর্গার কথা। কাঁদতে-কাঁদতে বাহির হয় দুর্গামায়ের খোঁজে। বটগাছের তলায় মা দুর্গা জটাজুটধারী, নড়ি হাতে বৃদ্ধার বেশে দর্শন দিলেন। বললেন, 'আমিই শুভদুর্গা। বৃক্ষে আমার অধিষ্ঠান। ভক্তিভরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সমপর্ণে আমাকে ডাকলেই সাড়া দেব।' এইভাবেই ধরাধামে প্রচার পায় মা শুভদুর্গার ব্রত।

চট্টগ্রাম, বগুড়া, ময়মনসিংহ— বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন কথায় বিভিন্ন ভাষ্য। বিভিন্ন ভাবে কোথাও বলে সুবচনী, কোথাও শ্রী দুর্গা... কিন্তু সর্বত্রই ইনি দুর্গার ভিন্ন রূপ, পার্বতী বলেই পরিচিতা, যিনি মানুষের কল্যাণে নিজেই নিজের ব্রত প্রচার করেন। কেবল আজও বহু পরিবারের পিদিমের আলোয়, ভক্তি ও সমর্পণে মায়ের অধিষ্ঠান।"

এরকম অদ্ভুত কাহিনি বাবাঠাকুরের মুখেই শোনা যায়। আমরা বাবাঠাকুরের ঘরে অনেক শুনেছি, তাই অবাক হলাম না। কিন্তু মাস্টারমশাই বাবাঠাকুরকে আর ছাড়লেন না, করজোড়ে বললেন, "জ্যাঠাবাবু, আপনি কী বললেন আপনি হয়তো জানেন না, কেবল সহজভাবে বলে গেলেন! কিন্তু বিবর্তনের ধারা আপনি একনিমেষে বলে ফেললেন। মানুষ যত সহজ-সরল হচ্ছে, দেবতাকেও তত সরলীকরণ করে নিচ্ছে। এ কী ভীষণ বিবর্তনের ধারা, আহা! তবে আর একটি অনুরোধ করি, জ্যাঠাবাবু?"

"বলো।"

"আপনি আর একটি মায়ের কথা বলবেন বলেছিলেন, সেটিও বলে দিন অনুগ্রহ করে। 'মা না হয়েও মা' বলেছিলেন..."

মুখের কথাটি মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে কাহিনি বলা শুরু করলেন বাবাঠাকুর।

"হ্যাঁ, মা শুধু নয়, পুরুষ হয়েও মা। তিনি মা রালদুর্গা।"

: রাল দুর্গা :

"সে এক সময়ের কথা, লক্ষীনারায়ণ দু'জনে পাশাপাশি বসে পাশা খেলতে বসেছেন। এদিকে মধ্যস্থতার জন্য কাউকে প্রয়োজন। নিত্য সেবাইত এক ব্রাহ্মণকে মধ্যস্থতায় বসালেন তাঁরা। উত্তেজনার পারদ চড়ে। শর্ত এই হয় যে, যদি লক্ষ্মী হেরে যান, তবে ব্রাহ্মণ ভস্মীভূত হবে; আর নারায়ণ হেরে গেলে ব্রাহ্মণ হবে 'কুটে আতুর' অর্থাৎ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত।

ব্রাহ্মণ আর কী করে, দেবতার কাজে লেগেছে এই ভেবেই সে আপনাকে ধন্য করে।

সেই খেলায় নারায়ণ গেলেন হেরে। ব্রাহ্মণ কুষ্ঠে আতুর হয়ে পথের ধারে পড়ে রইলেন। কিন্তু দেবতার সবই পরীক্ষা! রাজার মেয়ে ইছামতীর শিবপূজার ফুল আনতে যাওয়ার পথ ওইটেই! ব্রাহ্মণ অসহায়ের মতো পড়ে রইলেন পথে। পথ ছাড়েন না। শেষ পর্যন্ত রাজার মেয়ে তাকে শিবপূজা করে এসে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তবেই তিনি পথ ছাড়েন। হলও তা-ই।

এহেন বিবাহে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে আপন কন্যাকে পরিত্যাগ করলেন। বহু দূরে সেই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ আর রাজকন্যা কোনোমতে দিনপাত করতে লাগল। মা লক্ষ্মীর বড়ো দয়া হল। অনেক হয়েছে পরীক্ষা, তাঁদের জন্য কেন দুটি নিবেদিতপ্রাণ জীব কষ্ট পাবে?

মা লক্ষ্মী দেখা দিলেন সেই রাজকন্যাকে, বললেন, 'তুমি রাল দুর্গা/ রাউল দুর্গার ব্রত কর। রাল দুর্গার ব্রত খানিক কঠিন। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুনের অমাবস্যা হতে পূর্ণিমা অর্থাৎ চারমাস ধরে এই ব্রত করে, দুপুরবেলায় কলার মাঝপাতে ১৭টি আতপ চাল ও ১৭টি দূর্বা এবং তামার একটি টাটে সিঁদুর, চন্দন, ওড়ফুল, জবার মালা, জোড়া কলা দিয়ে নৈবেদ্য দিতে হবে।'

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সূর্যদেব ইছামতীকে দেখা দিলেন! সে তো অবাক। সে তো দুর্গা মা-র ব্রত করে, অথচ ইনি তো সূর্যদেব! যা-ই হোক, দেবতার বরে তার স্বামী আবার পূর্বের ন্যায় হল। ধনসম্পদ ও সন্তানাদির আশীর্বাদ নিয়ে সুখেশান্তিতে ঘর করতে লাগল ইছামতী ও ব্রাহ্মণ।

নিজের ভুল বুঝে ইছামতীর পিতা এসে মেয়ে-জামাইকে সাদরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। গৃহে গিয়ে রাল দুর্গার ব্রত পালন করে, অপুত্রক রাজা পুত্রসন্তান লাভ করলেন। সেই হতে মর্ত্যধামে রাল দুর্গা পূজা প্রচারিত হল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, সূর্যদেব তো পুরুষ; তাহলে তাকে এখানে রাল দুর্গা বলা হচ্ছে কেন?

সূর্যদেবকে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মদেব বা শস্য, জীবন এবং উন্নতির পুরুষ দেবতা বা রাল দেবতা হিসেবে ধরা হয়। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্টে দেখেছি রাউল (রাল) অর্থে সূর্য তথা ধর্ম। সূর্য না থাকলে জীবন, সৃষ্টি কিছুই সম্ভব নয়। মা দুর্গাও তা-ই। সেই দিক থেকে মা দুর্গার মতোই কল্যাণকারী রূপ কল্পনা করে পূর্ববঙ্গের উক্ত স্থানে এই রাল দুর্গা ব্রত পালনপূর্বক তাঁর পূজা করা হয়। এখানে, দুর্গাকে সামগ্রিক দুর্গতিনাশিনী ধরা হচ্ছে, না-ই বা হলেন সিংহবাহিনী!”

কাকাববাবু বাবাঠাকুরকে কী বলবেন জানি না, তবে এই কাহিনিটি আমাদের মাথায় ঢুকে জল ঢোকার মতো ফরফর করতে লেগেছিল। তাই আমরা আবার গজি খেলায় মেতে গিয়েছিলাম।

।। অপরাজিতা মা ও ইতিহাস ।।

বাবাঠাকুরকে পূজার সময় সহজে একা পাওয়া যায় না। সরাসরি পুজোয় তিনি যুক্ত থাকেন না ঠিকই, কিন্তু আমাদের দুর্গাপূজার পুরোহিতরা ও পরিচালনমণ্ডলী সুষ্ঠুভাবে পূজার্চনা পরিচালনার জন্য তাঁর উপরেই নির্ভরশীল। নিয়মের বাঁধনে ঠেকে গেলে তিনি ছাড়া গতি নেই। তাই বাবাঠাকুর রইতেন পশ্চাতে, যাত্রার প্রম্পটারের মতো।

বাবাঠাকুর কইতেন, "মায়ের খুঁটিনাটি খোঁজ নিয়ে না রাখলে কী চলবে! কয়টি দিনের জন্য মা এখানে এসেছেন, তাঁকে দেখে রাখতে হবে না? তোমরা দুপুরে খাওয়ার জন্য বাড়ি গেলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে! মা-কে এরকম একা রেখে যাবে না। তাঁর কি মনখারাপ করে না? বিশ্রাম তুমিও নিয়ো, মা-ও নিন। তা বলে তাঁকে একা রেখে যেয়ো না, এইখানেই বসো না!"

বাবাঠাকুরের কথায় মায়ের সঙ্গে এক অদ্ভুত আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করতাম। মা যে কেবল মৃন্ময়ী বা প্রস্তরের দেবীমূর্তি নন, তিনি যে আদতেই মা, এই বোধটি বাবাঠাকুর চমৎকারভাবে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন।

আজ নিভৃতে প্রশ্নটি করেছিলাম।

"বিভিন্ন ব্রতকথায় ও লোককথায় পর্যন্ত মা দুর্গার উল্লেখ পাচ্ছি; এ-ছাড়াও, সময়ের নিরিখে যখন কথা বলছি, আপনি বলছেন পালযুগ বা সেনযুগেও মা মহিষাসুরমর্দিনীর পূজা হত!"

"হ্যাঁ, হত তো, তবেই তো হত যুদ্ধযাত্রা। রাজারা অজেয় থাকার জন্য পূজা করতেন মা দুর্গারূপিণী অপরাজিতার... আজও হয়। তোমরা দশমীর দিনে মনখারাপ করে কেউ এদিক পানে আসো না, তো দেখবে কী করে!"

আমরা নড়েচড়ে বসলাম দালানে, আয়েশ করে হেলান দিয়ে মায়ের উদ্দেশে একবার প্রণাম করে বাবাঠাকুর বলা শুরু করলেন...

: অপরাজিতা-পূজা :

"অপরাজিতা পূজা— দুর্গাপূজাঙ্গ, অথচ প্রায় অনুচ্চারিত মা অপরাজিতার পূজা। দশমী সমাপনে বিসর্জন পূজার পর সেই মণ্ডপেই আর একবার বেজে ওঠে ঢাক।

কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধনের পর বিসর্জন পূজা সমাপনে শিবদূতী মা অপরাজিতার পূজা করেন ও শ্বেত অপরাজিতার লতা আপনার বাহুডোরে বেঁধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাই তিনি অপরাজিত হয়েছিলেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রও দেবী অপরাজিতার কথা উল্লেখ করছে। দশমীর পর যুদ্ধযাত্রায় রাজা অপরাজিত। তাই সেকালে যুদ্ধযাত্রার সূচিও হত তদ্রূপ। স্মার্ত রঘুনন্দ 'তিথিতত্ত্ব'-এ ব্যাসদেব ও মার্কণ্ডেয় উবাচে অপরাজিতা দেবীর বন্দনা করছেন— তিনিই ভয়ংকরী, মহারোদ্রী আবার তিনিই সিদ্ধিদাত্রী, মহাভয়বিনাশিনী।"

পুরোহিতমশাইও পূজা সেরে এসে পাশটিতে বসলেন, সেদিকে তাকিয়ে বাবাঠাকুর বললেন, আমাদের পুরোহিত দর্পণ বিধান দিচ্ছে,

"আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য দশম্যাং পূজয়েত্থা।
একাদশখ্যাং ন কুর্ব্বীত পূজনঞ্চাপরাজিতাম্ ॥"

অর্থাৎ, আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দশমীতে (বিজয়া দশমী) অপরাজিতাদেবীর পূজা করিবে। একাদশী যুক্তা দশমীতে পূজা করিবে না।

পুরোহিতমশাই মাথা নাড়লেন।

হরিকাকা বলল, "জ্যাঠা, এই মা তাহলে মা দুর্গার রূপই?"

"হ্যাঁ, তবে মাতৃকল্পটি কিঞ্চিৎ আলাদা—

ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসংকাশাং চন্দ্রকোটিসুশীতলাম্।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শুক্লবস্ত্রৈরলঙ্কতাম।
নানাভরণসংযুক্তাং চক্রবাকৈশ্চ বেষ্টিতম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েম্মন্ত্রী দেবীং তামপরাজিতাম্ ॥"

দুর্গারই আর একরূপ তিনি। চতুর্ভুজা— চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র পক্ষান্তরে দুই হস্তে বর ও অভয়মুদ্রা। গাত্রবর্ণ ঘোর নীল, পক্ষান্তরে উজ্জ্বল স্ফটিকের ন্যায়। ত্রিনয়না ও শশীভালী। চক্রবাক পক্ষী বা চখারা তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছে। দশমীর বিসর্জনের মন্ত্রপাঠের ঠিক পরেই মণ্ডপের ঈশাণকোণে অষ্টদল পদ্ম এঁকে, অপরাজিতা লতা রেখে এই দেবীর পূজা হয়। অষ্টদল পদ্ম অর্থাৎ সকল সিদ্ধি উন্মুক্ত, কোরক উদ্ভাসিত। তাই তিনিই জয়প্রদায়িনী অপরাজিতা।

কারও মতে এই বিশেষ রূপটি হল, শিবদূতী অর্থাৎ এইরূপে তিনি শিবকে দূত করে শুম্ভের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছেন, সে যেন তার সমস্ত রাক্ষসদলকে নিয়ে পাতালের গর্ভে চলে যায়; নতুবা তাদের সমূহ বিনাশ হবে।

বেদব্যাস অনুষ্টুপ ছন্দে তাঁকে 'পদ্মবীজ মাল্যধারিণী শ্যামা' অভিধায় স্তোত্র রচনা করছেন। কারণ তখন তিনি ঘোরবর্ণা।

শ্বেত অপরাজিত বৃক্ষ অথবা ঘটে দেবীর পূজা হয়।

ঈশানকোণে আঁকা হয় পদ্মদল। দশমী পূজা সেরে তবেই পুরোহিত নীরবে সংকল্প সারেন— হে দেবী ত্বম্ মম বিজয়ম্... অর্থাৎ, হে দেবী, আমাকে বিজয় প্রদান করুন। শ্রীরামচন্দ্রের দৃঢ়তায় জয়লাভ করি যেন।

তোমাদের তো পাওয়া যায় না, অপরাজিতার লতা পরার জন্য। নাহলে এই পূজা সেরে অপরাজিতার লতা পরা হল নিয়ম।

এই নিধুখুড়োকেই তোমরা জিজ্ঞাসা করে দেখো। কাকা তো প্রাচীন লোক, কাকা দেখেছেন, আমাদের গৃহে অর্থাৎ জমিদার বিশ্বাসদের গৃহে যখন মা পূজিতা হতেন, তখন বিশ্বাসরা তাঁদের প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র অষ্টমীর দিনে মায়ের পদতলে রেখে পূজা করতেন। তারপর একটা মিছে যুদ্ধের মহড়া বানানো হত। দশমীর দিন অপরাজিতা পুজোর পর, অস্ত্রপূজাটিকে বলা হত 'বীরাষ্টমী ব্রত'। খোদ বল্লাল সেন এই পূজা করতেন আর যুদ্ধের মহড়াতে জয়লাভ করে অপরাজিতা পূজাকে যথার্থনামা করা হত। একটা ছড়া শোনাই তবে,

"আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে॥
বাজতে বাজতে চলল ঢুলি।
ঢুলি গেল সেই কমলাপুলি॥
কমলাপুলির টিয়েটা।
সুয্যিমামার বিয়েটা॥
আয় লবঙ্গ হাটে যাই।
ঝালের নাড়ু কিনে খাই॥
ঝালের নাড়ু বড় বিষ।
ফুল ফুটেছে ধানের শীষ।।"

শরৎকালে অপরাজিতা পূজা সেরে বঙ্গাধিপতি চলেছেন যুদ্ধযাত্রায়। কারণ, আশ্বিনেই ধানের শীষ মানে ছড় আসে। সমুখে ও দুই পাশে বাগদি, ডোম সৈন্যেরা এবং ঢাকি ও ঢুলির দল ঢাক, মৃদঙ্গ প্রভৃতি যুদ্ধডঙ্কা বাজিয়ে চলেছে। কমলাপুরী তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্র। 'সূয্যিমামার বিয়েটা' অর্থাৎ কমলাপুরী পেরোতে তাঁদের ভোর হল।

এখানেই আবাস রক্ষা হল। আগে এগোনোর আগে 'লবঙ্গ' নামের গুপ্তচররা হাটে গিয়ে পরিস্থিতি মাপতে গিয়ে ঝালের নাড়ুতে বিষ মেশানো পেলেন। অর্থাৎ শত্রুসৈন্যকে পরাস্ত করার জন্য প্রতিপক্ষ রাজা বাজারের খাবারে বিষ মিশিয়ে রেখেছে। বাইরের আহার নেওয়া যাবে না এবং কমলাপুরীর পরিবেশ উত্তপ্ত। কমলাপুরীতেও গুপ্ত আক্রমণ হতে পারে। অর্থাৎ বুঝছ তো, আমরা হলাম প্রাচীন বীরের জাত।"

বড়দা হঠাৎ করেই বললে, "দাদু, তোমাদের অস্তর কই? ও-বাড়ি গেলে দেখায় না তো, তবে ও-বাড়ির ঠাকমা বলে তুমি নাকি বন্দুক-বোমা নিয়ে মানুষ মেরেছ... বোমা-পূজা দিতে গো..."

বাবাঠাকুর কথা বন্ধ করলেন। তাঁর মুখে যেন আষাঢ়ের মেঘ ঘনিয়ে এল। সহসা পরিবেশটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

অবস্থাটি চাপা দিতে তাড়াতাড়ি হরিকাকা বলে উঠলেন, "আচ্ছা জ্যাঠা, তোমার মনে আছে একবার আমাদের এখানে পুকুর খোঁড়ার সময় মায়ের দশভুজা মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। দলপাড়ায় মূর্তিটি পূজা পেত। স্বাধীনতার বছর ছয়েক আগে সরকার নিয়ে গেল জাদুঘরে রাখবে বলে।

মূর্তিটি আমার চোখে এখনও ভাসে গো, কালো শিলায় মায়ের দশ হাতে দশটি অস্ত্র; মহিষের মাথায় ত্রিশূল দ্বারা বিদ্ধ করছেন মা; মহিষের একটুকু জিভ বেরিয়ে আছে... আহা, সে কী মূর্তি!

সেই মূর্তিটি কিন্তু যথেষ্ট পুরাতন ছিল, সেটা দেখে আমরা সবাই বুঝতাম। কিন্তু হালে শুনছি, আমাদের এই দুর্গাপূজা শুরু হয়েছিল চারশত বছর আগে। তাইলে ওই দেবী বা দেব কে ছিলেন... "

হরিকাকার কথা থামিয়েই বাবাঠাকুর বললেন, "তোমরা বাধা দিলে না? জাদুঘরে রাখবে না ছাই! চুরি করে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

হ্যাঁ, ওই মূর্তি দুর্গামূর্তি, আদি মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি। এই যে মা এবং তার চার ছেলেমেয়ে একসঙ্গে আমাদের কাছে আসেন, এইটে হল চারশত বছরের পুরাতন। এটা আমাদের একচালা দুর্গা। মা দুর্গাকে ঘরের মেয়ে করে পুত্রকন্যা সমেত একটি চালায় একত্রে বাপের বাড়ি আসার এই সংযুক্তিকে একচালা দুর্গা বলা হয়। এইটে রাজা কংসনারায়ণ চালু করেছিলেন। প্রথম দুর্গাপুজো কবে কেউ বলতে পারে না। ওই যে ওই যে ঠাকুরটি পেয়েছিলাম, ওই দুর্গা পালযুগের দুর্গা। পালযুগে ও সেনযুগে মা দুর্গা আমাদের গৃহদেবী ছিলেন। ঢাকার ঢাকেশ্বরী, যোগাদ্যা গ্রামে যোগাদ্যা দেবী, মা সর্বমঙ্গলা— সবাই আমাদের প্রাচীন দুর্গা অর্থাৎ আদিরূপা দুর্গা মা। সে কথা বলব 'খন, আগে কংসনারায়ণের কথাটি শোনো।"

: একচালার মা :

"মায়ের একচালা মূর্তির কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজা কংসনারায়ণ। তিনি যজ্ঞ করতে পারেননি তো কী হয়েছে? স্বাধীন রাজা হওয়ার অধিকার পাননি, তাতেও আর খেদ নেই। অষ্ট লক্ষ অর্থব্যয়ের অস্থিরতা নেই। যাবতীয়

গ্লানিবোধ এই প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় ফিকে হয়ে গেছে। আহা, পণ্ডিত বলেছিলেন ঠিকই, এ মহাযজ্ঞেরও বড়ো। স্বয়ং রামচন্দ্রের আরাধ্যা তিনি... মা গো, এমন মনোহারা রূপ যেন ইহজীবনের প্রতিবছর দর্শন হয়— এইটুকুই প্রার্থনা!

রাজা কংসনারায়ণ ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বাঙালি বীর বিজয়লঙ্কের প্রপৌত্র। রাজা বিজয়লঙ্ক বাংলার বাইশটি পরগনার একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। মোঘল দিল্লীশ্বর দ্বারা বাংলার পশ্চিমদ্বারের দ্বারপতি হয়েছিলেন।

কংসনারায়ণ নিজেও ছিলেন দুর্দান্ত বীর এবং সমাজ সংস্কারক। দিল্লীশ্বর আকবরের প্রতি অনুগত থেকে পাঠান ও আফগান দৌরাত্ম্যকে বঙ্গ থেকে নির্মূল করে, বঙ্গের শাসনব্যবস্থা সুস্থিত করেন। বাংলার জমি জরিপ ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পঞ্জীকরণ করেন রাজা কংসনারায়ণ ও টোডরমল্ল। এই যে আধুনিক বাংলার ক্ষেত্র-ভাগ, এতেও তাঁর অনেক অবধান।

খুব স্বাভাবিকভাবেই, তাঁর মনে আশা ছিল যোগ্যতম হিসাবে বাংলার সুবেদার তিনিই হবেন। অথচ সময়ে দেখা গেল, তিনি পেলেন মাত্র দেওয়ানের পদ এবং 'রাজা' উপাধি। ব্যথিত মনে বাদশাহের চাকরি ছেড়ে তিনি নিজের জমিদারি তাহেরপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

নিদারুণ মানসিক বেদনায় জর্জরিত হয়ে আকুল হৃদয়ে তিনি এক মহাযজ্ঞে ব্রতী হতে চাইলেন— যদি মনে শান্তি আসে!

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কুলতিলক রমেশ শাস্ত্রী বিধান দিলেন, বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ— শাস্ত্রমতে চারটিই মহাযজ্ঞ। প্রথম দুটি কেবল সার্বভৌম সম্রাটেরা করতে পারেন। আর পরের দুটি কলিযুগে করা নিষিদ্ধ।

সুতরাং, একটাই উপায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত সেই মহাদেবী দুর্গার আরাধনা। যিনি নিজেই এক মহাযজ্ঞ।

শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সবাই করতে পারে এবং যজ্ঞের ফললাভ হয়। সেই অনাদিকাল হতে চলে আসছে পূজা। কোথাও তিনি গৃহদেবী, কোথাও শ্রীপাটবাসিনী। রমেশ শাস্ত্রী বর্ণিলেন দুর্গা মাহাত্ম্য—

দুর্গা শব্দের বর্ণগত অর্থের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ।
'দ'-এর অর্থ দৈত্য-নাশ অর্থাৎ অন্তরের 'কু' নাশ।
'উ'-এর অর্থ বিঘ্ননাশ
'র'-এর অর্থ রোগনাশ
'গ'-এর অর্থ পাপনাশ
'আ'-এর অর্থ ভয় বা শত্রুনাশ।
সামগ্রিকভাবে তিনি হলেন মহাবিঘ্ননাশিনী দেবী।

বসন্ত-শুক্লের অষ্টমী ও নবমী তিথিতে দেবীর পূজা করেছিলেন ভাগ্যবিড়ম্বিত রাজা সুরথ ও সমাধি শ্রেষ্ঠী।

তাঁদের দুর্গা মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন মেধস মুনি। পরম তার্কিকও উপলব্ধি করুন, রাজা সুরথ মেধার দ্বারা সমাহিত হচ্ছেন, শ্রীদুর্গা নামজপে!

তারপর শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধন করেন রাবণবধের নিমিত্ত। এই পূজা তিনলোকে মান্যতা পায়।

পূজিতা সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
মধুমাসে সিতাষ্টম্যাং নবম্যাং বিধিপূর্ব্বকম্।।
তৎপশ্চাৎ রামচন্দ্রেণ রাবণস্য বধার্থিনা।
তৎপশ্চাৎ ত্রিষু লোকেষু দেবতামুনিমানবৈঃ ।।

গোটা বরেন্দ্রকুল, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতসমাজ রাজি হলে, রমেশ শাস্ত্রী নিজেই শাস্ত্র হতে মন্ত্র নিয়ে গড়লেন বোধন, পূজাপাঠ পদ্ধতি।

বৃহৎ নন্দীকেশ্বর পুরাণ হতে খানিক বদলে তৈরি হল মূর্তি— গৌরবর্ণা মা, টিকোলো নাক, ঢলঢল আঁখি। তবে কেবল মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা নন, মাতৃত্বের শাশ্বত রূপটি ধরতে সঙ্গে রইলেন পুত্র-কন্যারা। উপরে দুই কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী। নিচে দুই পুত্র গণেশ ও কার্তিক। প্রতিমার পেছনে অর্ধচন্দ্রাকার চালা তথা চালচিত্র। চালাতে দশমহাবিদ্যা ও মহাদেবের চিত্র অঙ্কিত। এই প্রতিমাই আদি একচালার প্রতিমা। এই ভাবেই এল একচালা প্রতিমা। রাজা কংসনারায়ণের একচালা প্রতিমা।

মহাসমারোহে, ভীষণ আড়ম্বরে মায়ের পূজা হয়। এবং সেই হতে ১৯২৭ সাল অবধি কংসনারাণের বংশে মায়ের পূজার ইতিহাস পাওয়া যায়। ততদিনে মা আমাদের সার্বজনীন বা বারোয়ারি পূজাপাঠেও বঙ্গজননী।

আশ্চর্যের বিষয় বা ঐশী আশীর্বাদ যা-ই বলো, সুবেদার মুনিম খাঁয়ের আকস্মিক প্রয়ানে, বাদশাহ কর্তৃক যোগ্যতম হিসাবে বাংলার একচ্ছত্র সার্বভৌম সুবেদারি লাভ করেন রাজা কংসনারায়ণ। মা কিন্তু তাঁকে ব্যর্থ মনোরথ করেননি। তিনি যে মা।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা মা রইলেন বঙ্গেশ্বরী হয়ে, অগণিত বাঙালির ভক্তি, বিশ্বাস আর সমর্পণে আর রাজা কংসনারায়ণ এবং রমেশ শাস্ত্রীকে ঠাঁই দিলেন তাঁর অমর্ত্যভুবনে।

।। শংকরতারণী ব্রতঃ অলক্ষুনে নারীর কথা ।।

"সে এক পরোপকারী দম্পতির কথা, তাঁদের হাতিশালে হাতি, গোয়ালে গরু, ঘোড়াশালের ঘোড়া, গোলাভরা ধান— কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু মানুষের সব সুখের হয় না। তাঁদেরও অভাব একটি ছিল। সেটা হল অপত্যস্নেহের, দম্পতির সন্তান-সন্ততি ছিল না।

মানুষকে সংস্কার দেওয়া হয়েছিল, বাহন করার জন্য। কিন্তু মানুষ উলটো কুসংস্কারকে বহন করে। গ্রামের লোকও তাই, শুভকাজে তাঁদের মুখ দেখতে চাইত না, বলে আঁটকুড়া দম্পতি। অথচ আপদে-বিপদে তাঁদের কাছেই আসে হাত পাততে। সন্তানহীনা সেই রমণী দগ্ধ হয় প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত।

পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে বলে বিশেষ সুরাহা পায় না। ঘরের মধ্যে কেবলই কাঁদে সেই হতভাগিনী। একদিন এক বুড়িমা এলেন ভিক্ষা করতে। দাওয়ায় বসিয়ে বুড়িমা-কে খেতে দিয়ে সে পাশে বসল।

বুড়িমার স্নেহস্পর্শে, মিষ্ট কথায় তার মনে যেন প্রলেপ পড়ল। কেঁদেকেটে তার সব দুঃখ সে বুড়িমা-কে বলে ফেলল। বুড়িমা তাকে শংকরতারণী ব্রত করতে বললেন। এই ব্রত করলে মা তার মনস্কামনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন।

বুড়িমা বললেন, সারা বছরই এই ব্রত করা গেলেও জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ় মাসে এই ব্রতের পালনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

কী ভাগ্য, সেদিনই ছিল জৈষ্ঠ্য মাস পড়েছে! আর বিলম্ব করল না সেই বধূ। বুড়িমার কাছ থেকে ব্রতের সমস্ত প্রকরণ জেনে নিয়ে সেই রাতেই স্বামীকে জানাল।

বৃহস্পতিবারেই ব্রত করার নিয়ম। স্বামী চললেন বাজার করতে আর সেই বধূ পরম যত্নে গোবর-জল দিয়ে ঘরদোর নিকিয়ে, স্নান সেরে অপরূপ আলপনা দিল। মনের সবটুকু সুষমা উজাড় করে দিল সে তার আলপনায়। আম্রপল্লব ও ধান-দূর্বা দিয়ে সিঁদুরের ফোঁটা চর্চিত মা শংকরতারণী-র ঘট স্থাপন করল আলপনামধ্যে।

কলাপাতার তেকোনা ডগাটি কেটে, পরিষ্কার করে তার উপর ফল, গুড়, আতপ চাল দিয়ে নৈবেদ্য সাজালেন তিনি। ধুনো জ্বালিয়ে ঘটের সম্মুখে রেখে, পড়শিদের ডাকলেন। ব্রতকথার নিয়ম হল, মাহাত্ম্য-বর্ণন একা শোনা যায় না। তাকে প্রচার করতে হয়। সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয়।

ঠাকুরের পূজা বলে এসে পড়শিরা কেউ আপত্তি করলে না। সবাই এসে ব্রতকথা শুনে তিন ঝাঁক (সমবেত এয়োস্ত্রীর একসঙ্গে একবার উলু = এক ঝাঁক) উলু দিয়ে পূজা সম্পন্ন করলেন।

সকলকে মায়ের প্রসাদ বিতরণ করে দিলেন বধূ। এবার তার নিজের প্রসাদ খাওয়ার পালা। আটমুঠো চালের গুঁড়ো দিয়ে আগুনে সেঁকে পিঠে বানিয়ে রেখেছিলেন বধূ। এইটে ব্রতিনীর ব্রত-ভাঙনি।

প্রথম পিঠেটি খেলেন হাঁটু মুড়ে বসে মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করে। দ্বিতীয়টি খেলেন মাথা নুইয়ে এবং তৃতীয়টি ডান হাঁটুর ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে মুখে দিলেন।

তারপর একদিন ঘর আলো করে তার এক কন্যাসন্তান জন্মাল। বেশ কাটছিল দিন। নিয়ম করে তারা শংকরতারণীর ব্রত করে। কথাপাঠ করে ভারি সুখে-শান্তিতে তারা সময় কাটাচ্ছিল।

একদিন বিনামেঘে হল বজ্রপাত। কন্যার বিবাহের পূর্বেই সে বধূ ইহলোকের মায়া কাটালেন। বৃদ্ধ আর দেরি করলেন না— একটি বছর অশৌচকাল অতিবাহিত হতে উপযুক্ত পাত্র সন্ধান করে কন্যার বিবাহ দিলেন।

বিয়ে করে কন্যা শ্বশুরবাড়ি রওনা দেবে। রওনা দেওয়ার আগে তার মনে পড়ে, আজ যে বৃহস্পতিবার তায় জৈষ্ঠ্য মাস। তাড়াতাড়ি নিজের পুঁটলিতে সে গুছিয়ে নেয় আটমুঠো চাল, পাটকাঠি আর নৈবেদ্য সাজানোর মতো সামান্য কিছু জিনিস।

শ্বশুরঘরে এসে কালরাত্রিতে স্বামীর সঙ্গে তার থাকার নিয়মটি ছিল না। রাত বাড়তে সে চুপি-চুপি বাইরে এসে ছোট্ট করে আলপনা দিয়ে মায়ের ঘটটি সাজিয়ে, মনে-মনে মায়ের নাম করে আটমুঠি আতপ চাল দিয়ে পিঠে বানিয়ে পাটকাঠির শালায় সেঁকে নিয়মমতো খেয়ে নিল।

এদিকে তার স্বামীও বাহিরকর্মের জন্য সেই সময় বাইরে বেরিয়েছিল। আগেই বলেছি, পিঠে খাবার রীতিটি বড়োই অদ্ভুত। মধ্যরাত্রে নবোঢ়া স্ত্রীর এহেন অদ্ভুত কর্ম দেখে সে ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল। ভাবল, এই মেয়ে নির্ঘাত কোনো ছলাকলা জানে! কালরাত্রির কথা মাথা থেকে সরে গেল, স্ত্রীকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করল সে। এদিকে বধূও বারে-বারে একই কথা বলে চলে যে, সে মা শংকরতারণীর ব্রত পালন করে।

এতে তার স্বামী যুগপৎ ভীত এবং ক্রুদ্ধ হয় এবং স্ত্রীকে বিপদে ফেলার জন্য গোপনে তার গহনার পুঁটুলিটি পুকুরে ফেলে দেয়। পরদিন বউভাত। বধূকে নিজের হাতে সবাইকে পরমান্ন পরিবেশন করতে হবে। তখন এমন খালি গলায় তাকে দেখে সবাই তাকে দূর-ছা করবে এবং হয়তো কার্যক্ষেত্রে তাকে বাপের বাড়ি রেখে আসা স্থির হবে। তাহলে সে ওই ভয়ংকর মহিলা থেকে মুক্তি পাবে।

পরদিন সকালে উঠে বধূ গহনা আর খুঁজে পায় না। বধূ কেবল কাঁদে আর মা শংকরতারণীর কাছে বিচার চায়। বলে, 'মা, এ তোমার কেমন বিচার? তোমার আশীর্বাদে আমার জন্ম, অথচ তোমার ব্রত করেই আমি আজ দোষের ভাগী!'

নববধূ জানলার ধারে বসে কাঁদে আর এক বুড়িমা আসেন ভিক্ষায়। বধূর কাছে তখন কিছুই নেই, এ তার নতুন ঘর, সে কিছু জানেও না। মা শংকরতারণীর প্রসাদটুকুই ছিল, তা-ই দিল।

বুড়িমা সেই প্রসাদ বড়ো তৃপ্তি করে খেলেন। তারপর বললেন, 'তুমি আজকে সবথেকে বড়ো মাছটি কাটবে। ওই মাছের পেটের মধ্যেই রয়েছে তোমার গয়নার পুঁটুলি। ওটি পেয়ে গেলে হাত কেটে যাওয়ার অছিলায় তুমি পুঁটুলি নিয়ে উঠে আসবে। তারপর সে-সব পরে বাইরে যেয়ো, সব ঠিকই হবে। তবে তোমার স্বামীর জন্য শ্বশুরকুল সামান্য শিক্ষা পাবে।' এ-কথা শেষের পর বুড়িমাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না।

বধূও লাজলজ্জার মাথা খেয়ে শাশুড়িমায়ের কাছে মাছ কাটার অনুমতি চেয়ে কেঁদে পড়ে। শাশুড়িমা শেষমেশ নিমরাজি হয়ে সম্মতি দেন। ভাবলেন, নতুন বউয়ের বাপের সংসারে এতদিন হয়তো বড়ো-বড়ো মাছ আসত। সে-ই হয়তো সেগুলো কাটত। তাই আজকের শুভকাজের দিনে নিজে সে কাজ করতে চাইছে, তাকে বাধা দেওয়া উচিত হবে না।

বড়ো-বড়ো দেড় সেরি, দুই সেরি বোয়াল মাছ এসে উঠোনে পড়ে। বধূ রান্নাঘরে মাছ কুটতে বসে। বড়ো বোয়াল মাছটি কাটতেই তার পেটের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে সেই গয়নার পুঁটুলি। বধূ হাত কাটার ভান করে, সেই গয়নার পুঁটুলি নিয়ে ঘরে চলে আসে।

গা-ভরতি গয়নায় সজ্জিত হয়ে বধূ আসে অন্ন পরিবেশন করতে। তার অপরূপ লক্ষ্মীশ্রী দেখে গোটা গ্রামের লোক মুগ্ধ হয়ে পড়ে সবাই প্রশংসা করতে থাকে বধূর। কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যায় তার আপন স্বামীর। সে কীভাবে এই গয়নাগাঁটি পেল, তা তার মাথায় ঢোকে না!

তার মস্তিষ্কবিভ্রম ঘটে, পাগলের মতো সবার সামনে নিজের মাথা চাপড়ে হাসতে থাকে। সেই দেখে বিরক্ত হয়ে বয়স্ক অতিথি, অভ্যাগতরা খাওয়ার আসন ছেড়ে উঠে পড়েন। হাঁটুর বয়সী ছেলের সবার সম্মুখে এরকম হাসিঠাট্টা তাঁরা মেনে নিতে পারলেন না। তাদের পিছে-পিছে তাদের পরিবারের বাকি মানুষজনও ঘর ছাড়লেন।

আনন্দের অনুষ্ঠান-গৃহে কালো আঁধার নেমে এল। আজকে বউভাতের দিনে অতিথি অভুক্ত গেল— এ যে ভারি অমঙ্গল! সবাই মিলে প্রথমে দোষী করল ছেলেকে, তারপরে ছেলের বউকে।

ছেলের বউ সব সত্যি কথাই বলল এবং সেইসঙ্গে বলল, 'আপনারা সব মেনে মা শংকরতারণীকে স্মরণ করুন, সব ঠিক হবে।'

মায়ের কাছে আকুল হয়ে কেঁদে পড়লে তার স্বামী বোধ ফিরে পেল। বধু স্বামীকে বললেন ঘরে-ঘরে গিয়ে অতিথিদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে তাদের ডেকে আনতে...

দ্বিতীয়বার অতিথিরা এসে বসেন। এ-দিকে, অন্দরে আবার কান্নার রোল ওঠে। পরিবেশন করতে গিয়ে দেখা যায় যে, জৈষ্ঠ্য মাসের দারুণ গরমে অন্ন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বধূ স্থির বিশ্বাস রাখে, মা শংকরতারণীর ব্রত যারা পালন করে, তাদের কোনোদিন খারাপ হতে পারে না। নিজেই হাতা হাতে পরিবেশন করতে যায়, দেখে ওই সকল অন্ন এবং অন্যান্য ব্যঞ্জন একই রকম আছে।

সেইদিন সকল অতিথি-অভ্যাগতদের সামনে মা শংকরতারণীর ব্রত প্রচার হয়। আজও পদ্মাপাড়ের বাংলায় বহুস্থলে এই ব্রত এয়োতি ও কন্যারা পরম শ্রদ্ধায় পালন করে। আমি নিজে দেখে এসেছি। মায়ের সেই ব্রতের প্রসাদও অভাজন আস্বাদন করেছে।"

এতক্ষণ আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথা শুনছিলাম। আমরা বলতে শুধু আমরা নয়, আমাদের আটচালায় উপস্থিত সবাই। লক্ষ্মীপূজার তোড়জোড় চলছে। আটচালায় দূর্গাপূজার পরেই লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা হয়। প্রতিমা চলে এসেছে।

দয়াখুড়িমা বাপের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন। পায়ে-পায়ে চাতালে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর তাতেই উপস্থিত মানুষজন হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল। খুড়ো-খুড়িমা তথাকথিত আটকুঁড়ো দম্পতি। শুভকাজে নাকি তাদের হাত লাগানোর কোনো অধিকার নেই। যা তা ভাবে অপমান করলে খুড়িমাকে। দয়াখুড়োর দুই সম্বন্ধী আসছিল দিদির বাড়ি। তারা বাঁশ নিয়ে তেড়ে এল। রীতিমতো হাতাহাতির উপক্রম।

আমরা বাচ্চারা একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখছিলুম। বড়দাই বলল, "চল, বাবাঠাকুরকে ডেকে আনি 'গে। বাবাঠাকুর বলেছেন, কোনো মানুষ অচ্ছুৎ হয় না। তিনি বললে নিশ্চয়ই এরা শুনবে।" সেইমতো আমরা বাবাঠাকুরকে ডেকে এনেছিলাম।

কাহিনি শেষ করে বাবাঠাকুর বললেন, "দেখো, শাস্ত্রের বিধিতে কী লেখা আছে, সে নিয়ে তর্কাতর্কি করার মতো জ্ঞান আমার নেই। আর আমি এই বুড়োবয়সে এসে এতদিনের বিশ্বাসকে বদলাতেও পারব না। তবে করুণাকে(দয়াখুড়িমার নাম করুণাময়ী) দিয়ে শুভ কাজ না করাও, অন্তত বাজে ব্যবহার কোরো না। মন্দিরের চাতালে উঠলে কোনোদিন মন্দির অশুদ্ধ হয় না। কাউকে দেবদর্শনে বাধা দেওয়া পাপ।

আমরা যখন পথেঘাটে, জলপথে যাত্রা করি; নদীতে শৌচকর্ম করি। এরকম অজস্র মানুষের শৌচকর্ম গঙ্গায় গিয়ে পড়ে। তবে কী মা গঙ্গা অশুদ্ধ?"

সবার চোখ নিচে। তর্ক করার সাহস তো দূর। মাথাই তোলে না কেউ...

বাবাঠাকুর আবার বলেন, "দেবালয় কখনও অশুদ্ধ হয় না। তোমাদের বিশ্বাস তোমাদের কাছে থাকল। কিন্তু মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কোরো না। এই বুড়োমানুষটা তোমাদের কাছে অনুরোধ করছে।"

ফিরে যাওয়ার সময় খুড়ির মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, "মা রে! 'মা' শব্দটা এতটাই সাদা যে তাকে কেউ কাদা হাতে ছুঁয়েও মলিন করতে পারে না। তুই মন ছোটো করিস না। মায়ের মন ছোটো করতে নেই।! মালিন্যের সাধ্য কী মা-কে স্পর্শ করে! গঙ্গাজলে মানুষ শৌচ করে, স্নান করে আবার সে-জলেই পূজা হয়। মা-ও তো তা-ই।

'আঁটকুঁড়া', 'বাঁজা' অর্বাচীন শব্দ মাত্র! ওরা চিরায়ত মা-বোধকে ছুঁইবে, এত সাধ্য ওদের নেই!

যশোদার ঘরে নিজের সন্তান ছিল না, তাই তো আঁটকুড়ের ঘরে গোপাল নিজে এসেছিল। ভাগ্যগুণে চিল পাখিও মানুষের মা হয় রে... 'মা' এক মস্ত বোধ। সে কাহিনি বলব 'খন পরে। এখন একটু হাস। মায়ের মন খারাপ হলে মা লক্ষ্মী যে সেখানে আসবে না। এই বুড়ো বাপ সবার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। মাফ করে দিস। আজ থেকে আমিই তোর সন্তান।"

।। পশুত্বে চেতনা চিলনি-মা ।।

বাবাঠাকুর গ্রামের লোকেদের বলেছিলেন বটে, কিন্তু আমরা চিল মায়ের গল্প অনেক আগে থেকেই জানতাম। সে-কথাটাই এখন বলি...

সেকালে আমাদের গ্রামগঞ্জে বিশ্বকর্মা পূজার চলটি ছিল না। শুধু দেখতাম, হাটের দরজি কমলকাকা তাঁর সেলাই মেশিনটিকে মুছতেন, হরিপাড়ার মিস্ত্রিরা যন্তর ধুচ্ছেন আর বেলাদুপুরের ভ্যানওয়ালারা সব, ভ্যান ধুয়ে-মুছে উলটে রাখতেন।

সক্কাল-সক্কাল হারাণপুরুত ঢাউস ব্যাগ নিয়ে বেরোতেন পূজায়। যন্ত্রের গায়ে তেল-সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে, মন্ত্রপাঠ করে জল সাজিয়ে পূজা সারতেন।

আমরা এসব দেখতুম বটে, কিন্তু ওই সময়ে আমাদের দারুণ ব্যস্ততা থাকত, কারণ আমাদের পাড়াগাঁয়ে ওইদিন হল রান্নাপুজোর পান্তা অর্থাৎ ভাদ্র মাসের মনসাপূজা অরন্ধনের পরের দিন, পান্তা খাওয়ার দিন। শীতল খাওয়ার দিন।

আগের দিন সারা রাত ধরে মা-খুড়িরা রান্না করতেন। উনুন নিকিয়ে, দাওয়া নিকিয়ে মা বিষহরিকে স্মরণ করে শাঁখ বাজিয়ে শুরু করতেন রান্না। বিবিধ ভাজা, চচ্চড়ি আর মৎসপদে রান্না হত মায়ের ভোগ। শাপলার মৃণাললতা তার সহচর রূপে উপস্থিত থাকত উনুনশালে। সে এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ। সেই ভোরে শেষ হত রান্না।

পরদিন পান্তাভাত ও সেই বিবিধ পদে মায়ের নৈবেদ্য নিবেদনের পর আমাদের খাওয়া পড়ত। গ্রামে সবাই সবার আত্মীয়। কত বাড়ি যে পান্তা খেতুম তার ইয়ত্তা নেই।

মা বিষহরির কৃপায়, সে-ভোগের স্বাদ হত অমৃত। অতগুলি বাড়িতে খেয়েও যেন আশ মিটত না। রাত্রে যেতুম অপরদিকের পাড়ায়।

ওইদিন আমাদের ঘরে বাবাঠাকুরও এসেছিলেন তিনবার, ঠাকুর পান্তা খেতেন এই একটি বা দুটি ঘরে। দেহ রাখার আগে অবধি ফি বছর ঘুরে-ফিরে গ্রামের প্রতি ঘরে-ঘরে যেতেন; কোথাও পান্তা, কোথাও ফলমূল। নিজের ভিটেতেও ওই একদিন পা রাখতেন। বিষহরি মায়ের পাটে, ফণিমনসার শাখে নতজানু হয়ে বসে ভাববিহ্বল হয়ে প্রণাম করতেন। তারপর গৃহে প্রবেশ করতেন।

পান্তা খাওয়ার পর বাবারা তাকিয়া, বালিশ এগিয়ে দিতেন। কিন্তু বাবাঠাকুর বলতেন, "সংসারীর ঘরের বিছানায় আমি আর বিশ্রাম নিতে পারব না গো। ও আমার জন্য নয়। আমি বরং দাওয়ায় ওই মাদুর পেতেই বসি।" আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতেন, "ছেলেরা আয় গো, আজকের দিনে এক মায়ের গল্প শোনাই। বাকিদের ডেকে আন। জানতে পারবি, কীভাবে প্রাণীদেরকেও মাতৃ সম্বোধিত করে তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মাতৃবোধ যে কতখানি বিশাল তার প্রমাণ এই কথা। আসলে মায়ের কোন লিঙ্গ,ধর্ম, বর্ণ হয় না। মায়ের পরিচয় তার মাতৃত্ববোধে।

বরিশালে তখন আমি সংগঠনের কাজে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমাকে যে বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়েছে সে-বাড়িটি স্থানীয় এক কর্মকারের। তবে নিছক কর্মশালা নয়, ভদ্রলোক কারিগর। প্রায় দশ পুরুষের বাস, বংশানুক্রমে নবাবের কামানচি ছিলেন একদা।

সেই মানুষটার কাছে আসার উদ্দেশ্য আমার হাত দিয়ে কিছু নকশা পাঠানো হয়েছিল। যে নকশাগুলিকে পড়ে তাদের তৈয়ার করতে হবে।"

"কী করবে গো?" বড়দার ফুট কাটা স্বভাব।

বাবাঠাকুরও দমলেন না। বললেন, "ইঁদুর-মারা কল। এই বাড়ির একটা-আধটা ইঁদুর নয়। দিনের পর দিন পরের ক্ষেতের ফসল খেয়ে যাওয়া মেঠো ইঁদুরের দল ধরার কল।"

"কিন্তু স্বদেশীরা ইঁদুর... " বড়দা হয়তো আরও কিছু বলত। বাবাঠাকুর থামিয়ে বললেন, "তুমি বাবু বড্ড কথা বল। গল্প করার সময় কথা বললে, গল্পের ছানা কেটে যায়। গল্প হওয়ার পরে প্রশ্নটা করতে পারতে না?

"ভদ্রলোকের এলাকায় বেশ সুনাম ছিল। ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্কও ভালো ছিল। তবে, ভিতরে-ভিতরে ভীষণ রকম ব্রিটিশবিরোধী এবং কোনো কর্মচারী নিয়ে তিনি কাজ করেন না। তিনি কাজ করেন নিজের দুই ভাইকে নিয়ে, ফলত আমাদের কাজের খবর বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

আমি যখন গিয়ে সেখানে পড়েছি, তার কয়েকদিন পরেই বিশ্বকর্মা পুজো। ও-দেশে রান্নাপূজার চল দেখিনি। কিন্তু বাবা বিশ্বকর্মার পূজা বেশ বড়ো করে হয়। আগের দিন বসতবাড়ি, কারখানা-ঘর, উঠান, সমস্ত যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে সাজানো হল। হাপর-ভাটির আগুন ফেলা হল। আমি অতিথি মানুষ, তবুও তাদের সে ভীষণ পরিশ্রম দেখে আমি হাত লাগালাম।

বিশ্বকর্মা পূজার আগে আমাদের বাড়িতেও পালকি ধোয়া মোছা হত বটে।

পরদিন সক্কাল-সক্কাল সবাই স্নান সেরে পিঁড়ের ওপর সাজিয়ে ঘট পাতলেন। মাথায় ঘোমটা দিয়ে বাড়ির সবচেয়ে

বড়ো স্ত্রীলোকটি বসলেন আসনে, কোলের উপর জলভরা কোষাকুষি। রুপোর রেকাবে ছোটো-ছোটো করে টুকরো করা কিছু পানের বোঁটা। ভদ্রমহিলাকে সবাইকে বসার অনুমতি দিলেন। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম আমাকেও ডাকলেন। ঘিরে বসলাম আমরা সবাই। দেখলাম প্রতিবেশী মহিলারাও আসছেন। রীতিমতো আসর জমে গেল। সামনের সারিতে মহিলারা। পিছনের সারিতে পুরুষের দল।

শুরু করলেন চিলনি-মায়ের কথা।

অনেক-অনেক কালে আগের বর্ধিষ্ণু যজ্ঞচঞ্চু গ্রাম। তার একদিক দিয়ে চলেছে যজ্ঞেশ্বরী নদী আর অন্যদিকে তালবীথিকা।

অজস্র পাখির বাস তালবীথিকায়। কিন্তু এই পাখিরালার আলো ছিলেন এক জ্ঞানী চিলনি। রোজ দু'বেলা পাখিরা চিলনির কাছে বসে বিভিন্ন জ্ঞানের কথা শুনত। চিলনি ভুয়োদর্শী। পাখি হিসেবে কীভাবে রোজকার রসদ জোগাড় করে, ব্যাধের থেকে বেঁচে নিজের পরিবারের কাছে ফিরে আসতে হবে, সেই বিষয়ে পাঠ দিতেন চিলনি। চিলনি-মায়ের বয়স হয়েছে, তাই বৃক্ষশাখেই বসে থাকেন তিনি।

একদিন তিনি দেখেন নদীতে এক মাটির হাঁড়ি ভেসে চলেছে আর তার ভিতর থেকে আসছে মিহি কান্নার আওয়াজ। চিলনি তো তাড়াতাড়ি উড়ে গিয়ে বসেন হাঁড়ির ওপর। এ কী অপরূপ দৃশ্য! ভেতরে শোয়ানো পদ্মকুঁড়ির মতো সদ্যোজাত এক শিশুকন্যা। হাঁড়ির ভিতর ম-ম করছে পদ্মগন্ধ। সে শিশুর কপালে একটি ছোট্ট শ্বেতপদ্মের টিপ।

বাছা জানি না কতদূর থেকে ভেসে ভেসে আসছে... শিশুর গলার স্বর দুর্বল মিহি হয়ে পড়েছে। কোনোমতে কুঁইকুঁই করে কাঁদছে। ভারি মায়া হয় সে চিলনির।

সেই শিশুকে তিনি উদ্ধার করে আনেন। সকল পাখিরা মিলে গাছের উপর মাচা বেঁধে তারে ঘর করে দেয়। চিলনি-মা নিজের মেয়ের মতো মানুষ করতে থাকেন।

দিন যায়, মাস যায়.. মায়ের যত্নে কন্যা কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। রূপে লক্ষ্মী, চিলনি-মায়ের জ্ঞানে জ্ঞানী সেই কন্যা যেন সত্যিই এক কমল। সে যখন জলে অঙ্গমার্জনা করে, বহু দূর অবধি তার শরীরের পদ্মের গন্ধ ভেসে চলে।

একদিন এক তরুণ সওদাগর সপ্তডিঙ্গা নিয়ে চলেছেন বাণিজ্যযাত্রায়। নাকে আসে পদ্মঘ্রাণ, ভাবেন কাছাকাছি পদ্মবিল আছে বুঝি।

দ্রুত করতে বলেন ডিঙার গতি। যত এগিয়ে আসেন, নদীতীর ম-ম করে পদ্মের গন্ধে। কিন্তু আশেপাশে তো নির্জন ধু-ধু প্রান্তর! তাহলে কোথা থেকে আসে এমন সুবাস? পাড়ে নেমে খুঁজতে চলেন সেই সৌরভ-উৎস।

সওদাগর দেখা পেলেন এক কন্যার। সেই পদ্মগন্ধী রূপবতী কন্যার, কপালে যার ছোট্ট শ্বেতপদ্মের টিপ।

সওদাগর সরাসরি কন্যার পাণিপ্রার্থনা করেন। মানুষের কন্যা, সে-ও মানুষের সঙ্গ চায়।

মেয়ের বিয়ে হয়, গাছের ডালে বসে সজল নয়নে দেখেন চিলনি-মা। বিদায়বেলায় নিজের গাছে সুতো বেঁধে মেয়ের হাতে দেন। বলেন, 'মা আমার, ঘরে গিয়ে এই সুতো বেঁধে দিবি। যখনই বিপদে পড়বি। সুতো ধরে টান দিলে, আমি বুঝতে পারব। ঠিক চলে আসব। আর যদি আমি কাছে না থাকি, বিশ্বকর্মা ঠাকুরকে ডাকবি, তিনি রক্ষা করবেন। ওইদিনই যে তোরে পেয়েছিলাম। তাই মনে-মনে তুই ওর মানসকন্যা।'

নতুন বউ ঘরে আসে। সওদাগর বউকে চোখে হারায়। উঠতে বসতে পদ্মা আর পদ্মা। এদিকে সদাগরের ঘরে আরও

তিন বউ ছিল। তারা হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরে। ছোটোবউকে শায়েস্তা করতে কঠিন কাজের ভার দেয় – তুলো ধোনা, ঢেঁকিতে একাই চাল কোটা...

কন্যা হাসিমুখে আদেশ মাথায় নেয়। দুপুরে সবাই যখন বিশ্রামে যায়, চুপি-চুপি সুতো ধরে নাড়া দেয়।

সুতাগাছ খান নড়েচড়ে
চিলনী-মা আমার উইড়া পড়ে...

চিলনি-মা এসে জাদুবলে সব কাজ সেরে দিয়ে যায়। তিন সতীন ছাড়া গোটা শ্বশুরঘর ধন্যি-ধন্যি করে— 'নতুন বউ আমাদের রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী!'

ক্রোধ, প্রতিহিংসা অন্ধ। তিন বউয়ের তা-ই হল। রাতের ঘুম গেল, দিনের বিশ্রাম গেল। কেবল খুঁত ধরার চিন্তা...

একদিন সত্যি সত্যি ধরে ফেলল তারা। দশ কাহন ধান সেদ্ধ করতে দিয়েছে একবেলায়। ছোটো বউ সুতোয় টান দিল। খানিক পরেই উড়ে এল একপাল চিল। সামনে এক বৃদ্ধ চিলনি। তারাই সব কাজ সেরে দিল...

একদিন মেয়ে যখন নদীতে নাইতে গেছে, তারা সুতো টেনে চিলনি-মা'কে ডাকে। সেদিন কী ভাগ্যে মা একাই এলেন। আর অমনি জাল ফেলে, খপ করে ধরে, মুগুরের ঘায়ে গলাটি ভেঙে দেয়। খণ্ড-খণ্ড কেটে, চুপচাপ মাটিচাপা দেয় মৃতদেহ।

পরদিন মেয়েকে দিল বস্তা-বস্তা শিমুলতুলো পেঁজার কাজ। মেয়ে সুতো নাড়ায়। মা আসেন না...

একবার, দুবার, তিনবার... এইবার বুঝতে পারে। খুঁজতে-খুঁজতে সদ্য খোঁড়া মাটি দেখে, আংলে বের করে

আনে মায়ের নিষ্প্রাণ দেহ, কাঁদতে-কাঁদতে বিশ্বকর্মাকে ডাকে। মা বলেছিলেন, তিনিই শেষ উদ্ধার। তাই তাঁকে স্মরণ করে মায়ের শরীরখণ্ডে জলের ছিটে দেয় তিনবার...

হাড়ে হাড়ে জোড়া লাগল,
পাখায় পাখায় জোড়া লাগল,
বাবা বিশ্বকর্মা বিধিরে আজ্ঞা করল,
চিলনী-মা প্রাণ পাইল।

সত্যিই চিলনি-মা বেঁচে উঠল। উড়ে গিয়ে বসল নিজের গাছে।

এই অবধি বলে বয়স্কা সেই মহিলা উঠানে পানের বোঁটাগুলি পাখির মতো সাজিয়ে, কুশি দিয়ে জলের ছিটে দিয় সেই মন্ত্র আউড়ান। এইভাবে, তিনবার করে আবার কাহিনিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

আবার দিন কাটে, আবার সতীনরা মা-কে নতুন চক্রান্ত করে মেরে ফেলে। এবার আর ভুল করে না, কেটেকুটে রান্না করে মেয়ের পাতেই তুলে দেয়।

খেতে বসে মেয়ে। ভাত মুখে তুলতে গিয়ে দেখে, রান্নার থেকে তার মায়ের গায়ের গন্ধ আসে! আছড়ে পড়ে মেয়ে, হাপুস-হুপুস কাঁদে। তারপর সুস্থ হয়ে বাটিভরতি মাংস নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সন্তর্পণে।

আঁতিপাতি খুঁজে বাড়ি থেকে বহু দূরে মাঠের ভেতর মায়ের শরীরের পালক, নখ, ঠোঁট সব খুঁজে বের করে। বিশ্বকর্মার আশীর্বাদে, মেয়ের চেষ্টায় আবার প্রাণ ফিরে পায় চিলনি-মা।

এবার চিলনি-মা আর উড়ে গেলেন না। মুখোমুখি হলেন জামাইয়ের। সওদাগর লজ্জিত ও কুপিত হয়ে তিন বউকে বনবাস দিলেন।

চিলনি-মা যাবার কালে বলেন, এবার তার সংসার তাকে বুঝতে হবে। বালিকাপনা নয়, স্বাবলম্বী হতে হবে। নিজের গাছ আর মেয়ের ঘরের মধ্যেকার সেতু— সুতোটি কেটে দিলেন চিলনি মা।

মা মেয়ের চোখ মুছিয়ে বলে, 'জামাইষষ্ঠী আর বিশ্বকর্মা পূজায় আমার নেমতন্ন পাবি আর মন থেকে ডাকলে মা কী না এসে পারে...'"

"দাদা, তাহলে তুমি যে বলেছিলে চিলের মা হওয়ার গল্প শোনাবে। এইটেই তবে সেই?"

বাবাঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ, এটাই সেই।"

বড়দা আবার উত্তর করলেন, "এটা একটু বেশি অবাস্তব হয়ে গেল না?"

বাবাঠাকুর বললেন, "বলেছিলুম না ভাই, বোধ নিয়ে চলতে হবে? তুমি যদি আক্ষরিক অর্থে চিল ধরো, তাহলে বড়ো মুশকিল। এখানে চিল অর্থে আমি ধরেছি ভয়ংকর নির্মম এক ভাড়াটে সৈনিক বা ঘাতক সম্প্রদায়। যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে। ভাগ্যক্রমে কানীন সন্তানটি ভেসে আসে তাদেরই কাছে। তাকে মানুষ করে সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ, ভুয়োদর্শী সর্দার। তিনিই রূপকে চিলনি-মা। পালিত কন্যার বিবাহের পর কন্যার সঙ্গে তিনি চুপি-চুপি ওই নগরে পালিয়ে আসেন। কোনো সাংকেতিক ভাষার স্থাপনা হয়। সেভাবেই কন্যা ডাক দিত। আর তিনি কন্যাকে সাহায্য করতেন। গল্পকথাও মেশানো হয়েছে প্রচুর।

কিন্তু আসলটি হল মাতৃত্বের মোড়কে, বিশ্বাস সমর্পণের মোড়কে চমৎকার লোকশিক্ষা দেওয়া। প্রাচীন বাংলার কথা এবং ব্রতকথাগুলির উৎকর্ষ তো এখানেই। যত পড়বে যত জানবে, ততই এদের সার এবং অসার বুঝতে পারবে। আমি সামান্যই পড়াশোনা করেছি, তোমাদের অনেক বড়ো হতে হবে।"

।। দেবতার লাম্পট্য ।।

“শেষমেষ, একদিন পূর্বদিকের পর্বতের শিখরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছেলে। উদয়ের পথে সূর্যদেবের রথকে বাধা দিল ছেলে। সূর্যদেবের রথের ঘোড়ারা অগ্রাহ্য করে ছুটে চলে। বাধ্য হয়ে আঁকশি দিয়ে সে টেনে ধরল বাপের রথ। শকুনি-শিয়ালি এসে দিব্যি দিলেন সত্যের... ”

বাবাঠাকুর কাহিনি বলছেন দেখে আরও কয়েকজন এসে জড়ো হলেন। আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হল কাহিনি।

গ্রামেগঞ্জের নিরুপদ্রব জীবনে কোনো একটি ঘটনা ঘটলে বহুদিন ধরে তার রেশ চলে। তেমনই ঘটনা ঘটেছিল গত পরশু। ধান কাটার সামান্য বিষয় নিয়ে আমাদের গ্রামে দুটি প্রভাবশালী পরিবারের মারামারি বেঁধে গেছিল। শেষপর্যন্ত পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপে বিষয়টির মীমাংসা হয়।

আর সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল আমাদের আটচালা ঘরে। অবশ্যই বড়োরা আলোচনা করছিলেন। আমরা তো গজি খেলছিলাম।

ভুতোঠাকুরদা কইলেন, “মানুষ ক্ষমা করতে জানে না আর ক্ষমা করতে জানে না বলেই এত সমস্যা।”

হরি কাকা প্রতিবাদ করে কইলে, “না খুড়ো, যা-ই বল, মানুষ ক্ষমা করতে জানলে তো ঈশ্বর হয়ে যেত। ক্ষমা অনেক বড়ো গুণ। ওইসব মানুষের থাকলে তো ভগবান আলাদা করে থাকবেনি।”

খপ করে কথাটা ধরে নিয়েছিলেন বাবাঠাকুর। বললেন, “ভগবানমাত্রই নিখুঁত, নির্ভুল হন নাকি? তিনিও দোষ-গুণ করেন।”

আমরা গজি খেলা থামিয়ে, পায়ে-পায়ে আটচালার দিকে সরে আসছিলুম। বাকিরাও বাবাঠাকুরকে ধরে বসল। বাবাঠাকুর বললেন, "বেশ, আজ তবে তোমাদের ভগবানের লাম্পট্যের কথা শোনাব। এ গোটা কথা আমি গোয়ালতোড়, বাঁকুড়া ভ্রমণকালে ছেঁচেছি... "

: জিতাষ্টমী ও সূর্যদেবের কীর্তি :

"সে বহুকাল আগের কথা। অবন্তী নগরে বাস করতেন এক ব্রাহ্মণী। দীনাতিদীন তাঁর দশা। পিতা-মাতা-কন্যা দিনগুজরান করেন কায়ক্লেশে, চেয়েচিন্তে... দিন কাটে তো রাত কাটে না। ভগবান একদিক ভাঙেন তো অন্যদিক গড়েন। ঘরের ভেতর জমাট আঁধার, কিন্তু ব্রাহ্মণী অপরূপা, তাঁর রূপের ছটায় দশদিক পরিপূর্ণ। এইটেতে আরও সমস্যা ব্রাহ্মণের, কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না। ঘরের চারপাশে লম্পটরা ভ্রমরের মতো ভনভন করে।

হেনকালে রাজার বাড়ি শ্রাদ্ধের কাজ পড়ল। আর তখনই নিম্নচাপের বর্ষা আর আশ্বিনের ঝড়। শ্রাদ্ধকার্য আতপ চাল বিনে অসম্ভব। কিন্তু চাল মিলবে কী? আশ্বিনে ধানটি কেটেছে আর সেদিন থেকেই এই বৃষ্টি! চালই করতে পারে না কেউ। রাজা নিজে ধানীদের ঘরে ঘরে যান। সবাই করজোড়ে রাজাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'দোহাই রাজা, মাফ করেন। রোদ না উঠলে, আতপ চাল করি কী করে...'

রাজা মাথায় হাত দিয়ে বসে র'ন। এ কী অনাসৃষ্টি কথা! তবে কি শ্রাদ্ধই হবে না? এইভাবেই সব ভন্ডুল হয়ে যাবে?

তিনি যে মহাপাতক হবেন! পূর্বপুরুষের শাপে তার বংশ নির্বংশ হবে।

শেষে আমার সঙ্গে আলোচনা করে রাজা ঢ্যাঁড়া পিটলেন। ঢ্যাঁড়ায় দেয়া হল সোনার কনক। এই কনক যে গ্রহণ করবে, তার অর্থ সে আতপ চালের বায়না নিয়ে চাল এনে দেবে। এ-ও কথা রইল, পরিষ্কার আতপ চাল এনে দিলে, চাল প্রদানকারীর আর কোনো অভাব রইবে না।

ব্রাহ্মণীর বুভুক্ষু পেট মোচড় দিল। ব্রাহ্মণী সেই কনক গ্রহণ করলেন। এদিকে সূর্য ওঠে না। এমতাবস্থায় কী হবে! কনক গ্রহণ করার পর রাজাকে চাল না দিতে পারলে রাজা কিন্তু গর্দান নেবেন... কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে ব্রাহ্মণী খোদ সূর্যদেবের তপস্যায় বসেন।

সূর্যদেব ব্রাহ্মণীর রূপে মুগ্ধ হলেন এবং এই ফিকিরে ব্রাহ্মণীর তপে এলেন। কথা দিলেন, তিনি আতপ চাল করে দেবেন। তবে, পরিবর্তে ব্রাহ্মণীকে তাঁর একটি রাতের পত্নীস্বত্ব দিতে হবে। ব্রাহ্মণী রাজি হলেন।

সেই রাতে সূর্যদেব তার গৃহে অধিষ্ঠান করলেন। ভোরে আলোয় ভরে গেল চতুর্দিক। ব্রাহ্মণী কনক দিয়ে কিনে এনেছিলেন ভিজে ধান। সেই ধান খরতাপে শুকিয়ে আতপ চাল বানিয়ে দিলেন সূর্যদেব!

সাক্ষী রইল দুই নিশাচর শিয়ালিনী আর শকুনি। সূর্যদেব যাওয়ার কালে একটি পুঁইডাঁটা দিয়ে ব্রাহ্মণীকে বলে গেলেন, তিনি গিয়ে সূর্যদেবের সঙ্গে সরল বিশ্বাসে একটি রাত কাটিয়েছেন, তার জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। অতএব এই পুঁইশাক-ই তাঁর বর, ভবিষ্যতে তাঁর সকল দুঃখ-দুর্দশা নাশ করবে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ফল হল বিপরীত, পুঁই ভক্ষণ করে কিছুকালের মধ্যেই ব্রাহ্মণী হলেন গর্ভবতী। এ-সব খবর বাতাসের চেয়ে দ্রুত ছোটে। রাজার কাছে খবর গেল। পার্ষদরা

রাজার কান ভাঙাল। ক্ষুব্ধ রাজা ব্রাহ্মণীর সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে, তাকে কুলটা বলে নগরছাড়া করতে উদ্যত হলেন। হেনকালে এক দিব্যপুরুষ, পক্ষান্তরে ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ, উদয় হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরণ দিয়ে রাজাকে নিরস্ত করলেন। শিয়ালিনী এবং শকুনি সাক্ষ্য দিল। ব্রাহ্মণী মর্যাদা পেল।

যথাসময়ে চারি হস্ত ও দিব্য তেজ নিয়ে সন্তান জন্ম নিল। ছেলে বড়ো হতে থাকে। তার দিব্য তেজে চতুর্দিকে উদ্ভাসিত। কিন্তু সে যেখানেই যায় সমবয়সীরা তাকে বড়ো বেশি পীড়ন করে। তাই, ছেলে বারংবার বাপকে দেখতে চায়। বাপ ধরা দেন না।

শেষমেষ, একদিন পূর্বদিকের পর্বতের শিখরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছেলে। উদয়ের পথে সূর্যদেবের রথকে বাধা দিল ছেলে। সূর্যদেবের রথের ঘোড়ারা অগ্রাহ্য করে ছুটে চলে। বাধ্য হয়ে আঁকশি দিয়ে টেনে ধরল বাপের রথ। শকুনি-শিয়ালি এসে দিব্যি দিলেন সত্যের।

এইবার সূর্যদেব নতি স্বীকার করলেন। আপন নর-অংশকে আশীর্বাদ দিলেন এই বলে যে, 'জীমূত অর্থাৎ মেঘ সাম্রাজ্যের অধিপতি দিনমণির সন্তান তুমি, তাই তুমি জীমূতবাহন। সূর্যকুণ্ডল তোমার অভিজ্ঞান। আশ্বিনের কৃষ্ণ-অষ্টমীতে সন্তানজন্ম ও তার মঙ্গল কামনার্থে সমস্ত মর্ত্যলোকে তুমি পূজিত হবে। তোমা হতেই এই তিথি জিতাষ্টমী। তোমার সঙ্গে শকুনি-শিয়ালিও পূজিত হবে আজ।'"

"কিন্তু আমরা শুনেছিলাম, শকুনি-শিয়ালির গল্পখানি অনেক বড়ো। ভূপেনদা, তুমি বেশ অনেক জায়গা ঘুরেছ। সে-গল্প বলার দায় তোমাকেই নিতে হবে।"

আমাদের বড়ো দাদামশাই (ঠাকুরদা) কথাটি বললেন। তিনি যে কখন গুটি-গুটি পায়ে এখানে এসে উপস্থিত

হয়েছেন, তা আমরা জানতাম না। এতক্ষণে তাঁর কথায় আমার আমাদের সাড় ফিরল। বড়োদের গল্প শুনছি, তাই ধমক খেতে হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু ঠাকুরদা আমাদের দিকে প্রশ্রয়ের হাসি দিয়ে আমাদের পাশেই বসলেন।

বাবাঠাকুর বললেন দাঁড়াও, "ব্রতের কথাটি আগে তোমাদের বলে দিই। তারপর চিল-শকুনের সেই অদ্ভুত কাহিনি শোনাব।

কিংবদন্তি অনুসারে, মর্ত্যাধিপতি শালিবাহন রাজকে দেব জীমূতবাহন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর পূজা হবে উঠোনে পুকুর খুঁড়ে, তাদের বেল/কলা/বট/আখ/কচু/ধানের শাখা পুঁতে জীমূতবাহন রূপ কল্পনা করে। ব্রতিনীরা চাল, মটর, আতা, ঝিঙের বিবিধ নৈবেদ্য প্রদান করেন ওই পুকুরে।

ওই যে মা দুর্গার সম্মুখে ঘট— দেবীর ওই ঘটকল্প হল, অনুভবে এই ঘট বা পুকুর আদতে গর্ভাগার। যাতে ফলরূপ ভ্রূণ সূক্ষ্ম হতে স্থূল হয়। চিন্তন হতে দৃঢ় অস্তিত্ব হয়। আর তাই তো, জীমূতবাহন ষষ্ঠীরূপিনী মায়েরই পুরুষকার। বরং বলা যায়, পিতার পূজা।

সমগ্র রাঢ়বঙ্গে বিশেষ করে মেদিনীপুর, বাঁকুড়ায় এই জিতাষ্টমী বা বড়াষষ্ঠী অন্যতম লৌকিক উৎসব।

এবার শোনো তবে, শিয়াল-শকুনির গল্প।"

: শিয়াল-শকুনির গল্প :

"একদা মথুরা নগরে অপর্ণা ও অঞ্জনা নামে দুই সতীন বসবাস করতেন। প্রতি বছর রাধাষ্টমীতে নিয়মানুসারে ব্রতপালন করেন। এরকমই এক বছর উপবাসকালে ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে আড়ালে আহার করে ফেলেন।

তো, এই পাপের শাস্তি হিসেবে তাঁরা শিয়ালিনী ও শকুনি রূপে জন্মগ্রহণ করেন।"

হরিকাকা বললেন, "কিন্তু তুমি যে সবাইকে শিক্ষে দিয়ে বেড়াও, উপবাস করে বিশেষ কিছু লাভ হয় না... "

-"হ্যাঁ, তো। আমার গুরু বলতেন, 'খালি পেটে রইবে আর ছোঁকছোঁক করিবে, ওতে ভোজন দেবতারই পূজা হইবে'।

যেটা করতে হয় সেটা হল মুখে কিছু দিয়েই ঈশ্বর সেবা। নাহলে সেবায় মনোনিবেশ হয় না। তবে এ-কথাকে এভাবেই নিতে হবে। বহু যুগ ধরে কথা চলে আসছে ভাইপো, এ-কথার অন্যথা করা খুব মুশকিল।

তো যা বলছিলাম, শকুনির স্থান হয় বট গাছে আর শিয়ালিনীর স্থান হয় ওই বটতলারই পার্শ্বস্থিত খালপাড়ের ঝোপে।

ওরা দু'জনে তো ওখানেই রইল। প্রতি বছর ওই বটতলায় জিতাষ্টমী ব্রত ধুমধাম করে পালন হয়। অনেকে বটের শাখাও ভেঙে নিয়ে যান জিতাষ্টমী ব্রত পালনের জন্য।

পূর্বজন্মে তারা যেহেতু ব্রতপালনের অসম্পূর্ণতার জন্য এই অভিশপ্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে, তাই এই সমস্ত রীতির প্রতি তাদের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। এখন বটতলায় জিতাষ্টমীর ব্রতপালন দেখে তাদেরও ব্রতপালনের ইচ্ছে জাগে।

দিনের বেলায় ওরা উপবাস দিয়ে রইল। কিন্তু যে ক্ষুধা ওদের একবার কাল করেছে, সেই ক্ষুধা ওদের আবার পেড়ে বসল।

রাত যত বাড়ে শিয়ালিনীর ক্ষুধা তত বাড়ে। একপর্যায়ে জ্বালা সহ্য করতে না পেরে খাল থেকে ধরে একটি মাছ খেয়ে নেয়। কিন্তু একটি মাছে তার কী হবে? আবার খিদে পায় এবং খেয়ে ফেলে। এইভাবে ক্ষুধা তাকে প্রতি প্রহরেই

বিরক্ত করে চলে। এভাবেই প্রথম প্রহরে মাছ, দ্বিতীয় প্রহরে কীটপতঙ্গ এবং তৃতীয় প্রহরে ছোলা খেয়ে ফেলে শিয়ালিনী।

শকুনি সব দেখেছিল গাছের উপর থেকে তবুও ভোরের বেলায় শিয়ালিনীকে জিজ্ঞাসা করে, সে কিছু খেয়ে ফেলেছে কি না, কারণ, অনুতপ্ত মনে, সৎভাবে স্বীকার করলে অনেক দোষ কেটে যায়। সে তার সতীন বন্ধুটির জন্য এটুকু করতে রাজি ছিল। কিন্তু শিয়ালিনী সরাসরি নাকচ করল। শকুনি আর কিছুই বলল না। প্রত্যেকের নিজের কর্মের ফল ভোগ করতে হবে, যেমন তারা এখন করছে।

ফলও ফলে যায় অতি দ্রুত। ব্রতভঙ্গের জন্যে শিয়ালিনীর বাচ্চারা মারা যায়। শকুনি পূর্ণমনে ব্রত পালন করেছিল, এবার আর ভুল করেনি। তাই শকুনির বাচ্চারা সুস্থ-সবলভাবে বেড়ে ওঠে।

এদিকে শিয়ালিনী রাগে, ক্ষোভে, হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরতে থাকে এবং তার সঙ্গে শকুনের ঝগড়া বাড়তে থাকে দিন-কে-দিন। এইভাবেই দু'জনেই ঝগড়া করতে-করতে একদিন ধোপাদের কাপড় কাচার গরম জলে পড়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে।

ধোপা বেচারা আর কী করে, মৃতদেহ দুটিকে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ফেলে দেয়। দৈবলীলায় ওই দেহগুলো দুটো সাদা শালুক ফুলে রূপান্তরিত হয়ে ভাসতে-ভাসতে চলে যায়।

এভাবেই কর্ণাট রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয় সেই দুই ফুল। সেই রাজ্যের দুই রানী কুন্তবতী ও প্রভাবতী দীর্ঘদিন ধরে ঈশ্বরের আরাধনা করেও সন্তানলাভ করেননি। তাঁরা রোজ স্নানের কালে ঈশ্বরের কাছে আরাধনা করতেন।

আজ হঠাৎ করে এই শ্বেতধবল শালুক ফুল দুটিকে ভাসতে দেখে, ঈশ্বরের করুণা ভেবে ফুল দুটি খেয়ে নেন। অল্প কিছু সময়ে দু'জনেই একসঙ্গে গর্ভবতী হন।

যথাসময়ে দুই রানি দু'টি কন্যাসন্তান প্রসব করেন। রানি কুম্ভবতীর মেয়ের নাম হয় চম্পা। প্রভাবতীর মেয়ের নাম হয় মনোরমা।

দুই কন্যা খুব আদর-যত্নে বড়ো হয় এবং যথাসময়ে রাজা তাদের বিবাহ দেন। বিবাহ-পরবর্তীতেও কন্যাদের সংসার বেশ সুখেই চলছিল। কিন্তু গোল বাধল সন্তানধারণের সময় থেকে।

মনোরমার সন্তান বেঁচে থাকে কিন্তু চম্পার সন্তান থাকে না। বোন হয়েও ঈর্ষায়, ক্রোধে চম্পা অন্ধ হয়ে যায়। আপন বোনপো অর্থাৎ মনোরমার সন্তানদের নাক-কান-হাত কেটে দেয়। কিন্তু প্রভু জীমূতবাহনের আশীর্বাদে মনোরমার সন্তানরা তৎক্ষণাৎ আগের রূপ ফিরে পায়।

ব্যর্থ চম্পা দারুণ গ্লানি ও খেদে জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে যায়। সেই সময় মা দুর্গা সেই স্থল দিয়ে আমাদের মর্ত্য হতে কৈলাসধামে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। মা দুর্গা সন্তানের দুর্দশা দেখে তাকে উদ্ধার করেন এবং সৎ বিশ্বাসে, সরল মনে, হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ করে, পূর্ণ নিয়মে জিতাষ্টমী ব্রত পালনের নির্দেশ দেন।

কালাতিক্রমে সন্তান-সন্ততি দেখে দুই বোন সুখী মনে স্বর্গ আরোহণ করেন বৃদ্ধ বয়সে। আর সেদিন হতে প্রভু জীমূতবাহনের সঙ্গে তাদের দুই বোন অর্থাৎ শিয়াল-শকুনির পূজা শাশ্বত হয়। প্রভু জীমূতবাহনের জন্মতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এক শিয়াল-শকুনি আর তার ব্রতকে চিরায়ত করলেন আর এক শিয়াল ও শকুনি।

এর অর্থ কী, বলুন দেখি উপস্থিত গুরুজনেরা?"

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে দেখে, বাবাঠাকুর নিজেই উত্তর দিলেন, "এর অর্থ শিয়াল-শকুন কেবল ইতর প্রাণী নয়। কথার মধ্যেকার বোধটি হল— সর্বসম্প্রদায়ের মানুষ যদি সরল বিশ্বাসে তাঁর আরাধনা করে, তিনি তাদের কথা শোনেন। জাত-পাত-মান ভেদ ঈশ্বর করেন না।

।। লাল দুর্গা ।।

"সিপাহি বিদ্রোহের পরাজয়ের পর চারজনকে নিয়ে রজব আলি খান হারিয়ে যান। সন্দীপের জমিদার আবু তোরাপ, তার আগে চাকমারা...

চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে সেই সমস্ত কিংবদন্তি ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। আর তাই তো প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাস্টারদার মতো মানুষ ফিরে ফিরে আসেন। জায়গাটার মাটিতেই বিপ্লবের ঘ্রাণ!

আমাকে পাঠানো হয়েছিল এইসব অঞ্চল থেকে এই ঘ্রাণ অর্থাৎ বিপ্লবের গল্প একটু একটু করে জমিয়ে এনে, সেগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তোমরা তো জানোই আমার কাজই ছিল লেখা।

আমাদের ছোটো-ছোটো ঘরোয়া ছাপাঘরে বইগুলি বিপ্লবের মন্ত্র বয়ে, মাতৃমন্ত্র বুকে নিয়ে ছড়িয়ে পড়ত। সে তো আর এখনকার দিন নয়। ইস্কুলে-কলেজে গোপনে ছড়িয়ে দিতে হত। তবে তখন আমার বিপ্লবের পাশাপাশি মাতৃমন্ত্রের দীক্ষাও হয়ে গেছে। নিজের ভেতর থেকে বৈরাগ্যের ভাব প্রবল হচ্ছে। পথিমধ্যে কোন গ্রাম, গঞ্জে রাতে থাকার থেকে শ্মশানে রাত কাটাতে ভালো লাগে। খেয়েদেয়ে এসে শ্মশানের চাতালে শুয়ে পড়ি। কোনো সাধু পেলে তার সঙ্গ করতে ভালো লাগে।"

বললুম, "ভয় লাগত না?"

বড়দা কথা ধরল, "আরে, দাদু নিজের হাতে পুলিশ মেরেছে না! পিস্তল চালাতে জানলে, ভয় কেটে যায়।"

বাবাঠাকুর হেসে বললেন, "শ্মশানে কীসের ভয় ভায়েরা। শ্মশান সবচেয়ে পবিত্র ও নিশ্চিন্ত স্থান। আরে! আমাদের প্রত্যেকের দেহের মধ্যেই শ্মশান আছে— আমাদের অন্তর। অন্তরের মধ্যে দাহ হয়। খেদ, অনুতাপ, অতৃপ্তি প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে দগ্ধ করে।

তেমনই, শ্মশানে নশ্বরদেহের যাবতীয় কৃতকর্ম, গ্লানি, ক্লেদ সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে অবিনশ্বরের দিকে যাত্রা করে। আর, শ্মশানে তো স্বয়ং মা শ্মশানকালী রয়েছেন। তিনি থাকতে কীসের ভয়!

সে-কথা থাক, যে কাহিনিতে ছিলাম সে কাহিনিতেই ফেরা যাক। চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে আমি তখন চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দুর্গাপূজা সমাগত। মনে-মনে বাসনা রেখেছি মাতৃদর্শনের।

ঘুরতে ঘুরতে ব্রাহ্মণবেড়িয়া অবধি চলে এসেছি। ভৈরবে এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। ভদ্রলোক বিপ্লবীমনস্ক এবং সরকারি চাকুরে। তাই তার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া কিঞ্চিৎ সুবিধাজনক ছিল। বিশেষ করে একজন সাধুবাবাকে আশ্রয় দিলে সন্দেহের চোখেও দেখবে না।

জপ-তপ করি আর আশেপাশের সংগঠনের পরিবেশ বুঝি। কিন্তু মন খালি মা-মা করে। তবে, সংগঠনের কাজে আমি ফাঁকি দিলাম না। এরই মধ্যে আমি ভীষণ জ্বরে পড়লাম। ওঁরা আমার খুব সেবা করলেন। মাঝেমধ্যে জ্বরের মধ্যে দেখতাম, একটি চোদ্দো-পনেরো বছরের সধবা বালিকা এসে আমার সেবা করে যাচ্ছে। সন্ন্যাসী বলে সে-মেয়ে দ্বিধা করেনি। কিন্তু খুব যন্ত্রণার মুহূর্তেই সে আসত। তার সে পথ্য দেওয়া মাথায় হাত রেখে জ্বর মাপা, জলপট্টি দেওয়া আমাকে ভীষণ শান্তি দিত।

সুস্থ হয়ে উঠলে আমি গৃহত্যাগের পূর্বে ভদ্রলোকের কাছে সেই মেয়েটির পরিচয় জানতে চাইলাম। ভদ্রলোক তো অবাক! অমন কোনো মেয়ে এ-বাড়িতে নেই। আমি সমস্ত বর্ণনা দিলাম। ভদ্রলোকের স্ত্রী এবং ভদ্রলোক কেঁদে পড়লেন। তাহলে কী তাঁদের মেয়ের কোনো বিপদ হয়েছে? কারণ, যে বর্ণনা আমি দিয়েছি তা হুবহু তাঁদের কন্যার সঙ্গে মিলে যায়! তাঁদের কন্যার বিবাহের পর এটিই প্রথম বছর, কিন্তু শ্বশুরঘর থেকে তাকে পিতৃগৃহ পাঠাবে না। সে-বাড়িতে পূজার সময় ঘরের লক্ষ্মীকে বাহির হতে দেয় না, অমন নিয়ম নেই।

খুব বেশি দূর নয়, রাজনগরে তাঁর কন্যার শ্বশুরবাড়ি। গরুর গাড়িতে দুই প্রহরের রাস্তা। ভদ্রলোক দ্রুত তৈরি হতে লাগলেন। আমিও কেন জানি না, তাঁর সঙ্গে জুড়ে গেলাম। আমার সেই মেয়েটিকে দেখার বড়ো সাধ হচ্ছিল। কিন্তু তখনও জানি না এ-সবই অদৃষ্টের ইচ্ছা।

যে গ্রামটিতে মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল, সেই গ্রামে পৌঁছাতে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেল, গ্রামের অভ্যন্তরে ঢুকতে সন্ধ্যা নেমে এল। কিন্তু সেখানে তখন দিনের মতোই উচ্ছ্বাস। সার-সার মশালের আলো, আকাশ-বাতাস মুখরিত, আজ গাঁয়ে মায়ের অধিবাস!

মেয়েটির শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দারুণ আপ্যায়ন হল। সে মেয়েও খানিক পরে একমাথা সিঁদুর আর গা-ভরতি গয়না নিয়ে ঢিপ করে এসে প্রণাম ঠুকলে। এই মেয়ে খানিক তেমনই বটে, কিন্তু ঠিক সেই মেয়ে নয়। তবে সেই কথা আমি আর কইলাম না।

স্নান সেরে পরিচ্ছন্ন বস্ত্রে চললুম মায়ের দর্শনে। এই দেখো ভাইয়েরা, আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠছে...

হাজার মশালের উদ্ভাসিত আলোয় তিনি আমায় দেখা দিলেন। অদ্ভুত তাঁর রূপ, সিঁদুর-লাল মায়ের গাত্রবর্ণ! আর সেই কোমল, করুণাময় মুখশ্রী— এ যে সেই চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকা! থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়েছিলাম। আমার সাড় ছিল না। সহস্র, অযুত জানি না কতবার মা জপেছিলাম।

পরে শ্রবণ করেছিলাম মাতৃমাহাত্ম্য। কেন এই অপরূপ রূপ শোভা তাঁর।

সে বহুকাল আগের কথা, সর্বানন্দ দাশ নামে এক ভাগ্যান্বেষী বাঙালি অসমের শিবসাগরে চলে আসেন কর্মের সন্ধানে। সেখানকার এস্টেটে মুনশির কাজ জোটান।

সর্বানন্দ মুনশি হলেও তার কর্মজগতের বাইরে অন্তরে তিনি একজন সাধক। শিবসাগর এস্টেটের কর্মের বাইরের সময় সাধনাতেই কাটে। কামরূপ-কামাখ্যা কৌল-সাধনার এক পীঠস্থান। এমন স্থানে থাকলে মা আর অন্তরের আকুতি ভিন্ন কোনো চিন্তা থাকে না।

সর্বানন্দও ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ এক সন্তান। স্বল্প আয়াস, কিন্তু প্রতি বছর পূজা তিনি করেন। সেবারেও দুর্গাষ্টমীতে পূজা করবেন, কুমারী পূজার প্রয়োজনে সন্নিহিত অঞ্চলে এক কুমারী বালিকা চাইলেন। পেলেন। এক গৃহে এক পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা। আহা! সাক্ষাৎ মা সুভগা**।

রমেশ শাস্ত্রীর আধুনিক দুর্গাপূজা বিধি, পুরোহিতদর্পণের বহু আগে থেকে এই কুমারী পূজার চল ছিল। 'কুমারীপূজা-প্রয়োগ' গ্রন্থমতে, এ-পূজা বহু প্রাচীন। এক হতে ষোলো যে-কোনো বয়সের কুমারী কন্যাই মাতাজ্ঞানে পূজিতা হতে পারেন।

** এক থেকে ষোলো বছর অবধি কুমারীদের তন্ত্র/কৌল-মতে ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়, পঞ্চমবর্ষীয়া হলেন সুভগা বা সুললিতা।

আসলে, প্রতিটি কুমারীই তো আদতে মাতা। এ-জগতের প্রতিদিনের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বীজাকারে কুমারীতেই সুপ্ত। কুমারীর অর্থ সম্ভাবনা বা প্রকৃতির বীজাবস্থা। তাই কুমারীতেই দেবীভাব আরোপ করে তার সাধনা করা বা চারাকে বৃক্ষ হওয়ার জন্য আহ্বান করা।

তবে পৌরাণিক কারণটি হল, দুর্দান্ত বাণাসুর একসময় স্বর্গ-মর্ত্য অধিকার করেন। পরাহত দেবকুল মা আদ্যাশক্তির শরণাপন্ন হন। মাতা পুনর্জন্ম নিয়ে কুমারীরূপে বাণাসুরকে বধ করে জীবকুলকে ত্রাণ করেন। এই থেকেই কুমারী পূজার প্রচলন।

আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি, সর্বানন্দ ভক্তিভরে সেই কুমারীকে মাতা ভগবতীজ্ঞানে পূজা করতে থাকেন। ছয় ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। পূজা সমাপ্ত হয়ে আসে আর কুমারীর গায়ের রং একটু একটু করে বদলাতে থাকে। এক পর্যায়ে সেই গৌরবর্ণা কুমারী লাল টকটকে রঙে বদলে যায়।

সে কন্যা বরমুদ্রা ধারণ করে গমগমে ভারী, দৈবীকণ্ঠে সর্বানন্দকে আশীর্বাদ দিতে উদ্যত হন। সর্বানন্দ বুঝতে পারেন, মা তার আবাহনে সাড়া দিয়েছেন। তিনি এসেছেন এই কন্যার মধ্যে (ভর হওয়া)। মায়ের পদতলে আছড়ে পড়ে, নিজের পৈত্রিক ভিটেতে মায়ের পূজা করার বর চান তিনি।

মা কথা দেন। রাজনগরের পাঁচগাওতে তাঁর পৈতৃক ভিটেতে মা এই 'লাল দুর্গা' রূপেই পূজিতা হবেন। ফিরে আসেন সর্বানন্দ। শুরু করেন পূজা। সেই মা আজও পূজা পেয়ে চলেছেন নিয়মিত।"

বড়দা বললে, "তাহলে তো আমাদের নটুও কুমারী হতে পারে?"

বাবাঠাকুর বললেন, "হ্যাঁ পারেই তো... কুমারী পূজায় কোনো জাতি, ধর্ম বা বর্ণভেদ নেই। দেবীজ্ঞানে যে-কোনো কুমারীই পূজনীয় । এক থেকে ষোলো বছর বয়সী যে-কোনো

কুমারী মেয়েই কুমারী মা। কেবল নামগুলি আলাদা। যেমন ধরো, এক বছরের কন্যা হল সন্ধ্যা, দুই বছরে সরস্বতী, তিন বছরের কন্যা ত্রিধামূর্তি, দশ বছরের কন্যা অপরাজিতা, ষোলো বছরের কন্যাটি অন্নদা বা অম্বিকা এইভাবে।"

আমি বললাম, "তারপর?"

বাবাঠাকুর কইলেন, "তার আর পর নেই। এবার বাড়ি যাও গে.. "

।। মলুটির মা ।।

"নদীর এ-পাড়ে কেউ-ই আসে না। ক্ষুধার্ত শিবা, বাঘরোল, সারমেয়র উল্লাস বই আর একটিই শব্দ এখানে শোনা যায়; ফটফট করে কাঠের গাঁট ফাটার আর্তনাদ— চিতের কাঠ পুড়ছে।

গামুই, ডোমরা আসে বেলাবেলি। দাহ অর্ধসমাপ্ত করে জলছড়া দিয়ে চলে যায় বেলা পড়ার আগে। এ-অরণ্য বড়োই অশৈলী।

ক্ষণে-ক্ষণে উত্তুরে বাতাসের দমকা আসে, ছাইমাখা ধুলো পাখসাট মারে। বাঁশে-বাঁশে কর্কশ ঘষা লাগে। ঘনসন্নিবিষ্ট পত্ররাজির মধ্য হতে বাতাস বওয়ার শনশন শব্দ যেন সহস্র প্রেতের হাহাকার, মাটি কামড়ে থাকার আকুতি।

নিভু-নিভু চিতারা আর একবার মুখব্যাদান করে... ধক্ ধক্ করে জ্বলে ওঠে শেষ লেলিহান শিখা। দাহ— স্থূল অস্তিত্বের মহাজাগতিকে লীন হওয়ার সেই চিরায়ত বিক্রিয়ার কটুগন্ধ উত্তুরে হাওয়ায় ভেসে প্রবেশ করে জঙ্গলের গভীরে।

একা মানুষটির পদচালনা দ্রুত হয়। মায়ের সান্ধ্য ভোগজল দেওয়া হয়নি। মাঠ ভেঙে, নদী সাঁতরে তিনি এসেছেন। ভিজে গায়ে উত্তুরে বাতাস সূচের মতো বেঁধে কিন্তু মাতৃনাম অন্যদিকে মনকে চালিত হতে দেয় না।

কুঁড়েটায় গিয়ে ঢোকেন। দরমার একচিলতে ঘরে ঢুকে বুক ভরে শ্বাস নেন। ওরা বলে এ ঘরে শ্মশানের কটুগন্ধ। ভুল বলে। যে-ঘরে সহস্রবার মাতৃনাম জপ হয়, সেই ঘর সুবাসিত। মানসের নীলপদ্মের সুবাস এ-ঘরে। আবেশ আসে, ঘোরবসনা

মাতৃমূর্তি কল্পে সাধনে বসেন সিক্ত বসনে। এতক্ষণ চাঁচের বেড়ার ফাঁক হতে বাতাস ঢুকে প্রদীপশিখাটিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল। এখন বাতাস পড়ে যায় অথবা মাতৃনামের বেড়ায় বাঁধা পড়ে। স্থির, নিস্কম্প হয় শিখা। আলোকিত শিখার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ঘরখানা। যেন একটি প্রজ্জ্বলিত উল্কাপিণ্ড এসে পড়েছে বনমধ্যে।

পুঁটুলি খোলেন সাধক। বড়ো যত্নে বেঁধে এনেছেন খাবার। জল ঢুকতে দেননি। তাঁর মায়ের ভোগ।

'মা' ডাকের বিবিধ মুদ্রায় মুখরিত হয় ঘরখানা। কখনও সন্তানের অনুনয়ের মুদ্রা, কখনও সন্তানের আদেশ, ছদ্মরাগ। কখনও ভক্তির ডাক...

পাণ্ডাকুল মন্দিরে বসে জানতে পারেন না, মা তাঁর সন্তানের কাছে ভোগ খেয়ে যান।

মা সর্বগামী। চার-দেয়ালের মন্দিরই কেবল তাঁর ঘর নয়। ওরা বোঝে না শ্বেত শিমুল আসলে এক নাভিরজ্জু, যার এপারে তারা সন্তান আর অপরপারে ব্যাপ্ত মা, স্বয়ং ব্রহ্ম তিনি। তিনি সব, তিনি সর্বত্র, তিনি ব্রহ্মময়ী তারা।

সাধকের চোখে জলের ধারা নামে। মা-ও কি কাঁদেন সন্তানের এ-সুখে.... কে জানে!

এরকম অজচ্ছ কিংবদন্তি আর কথা না ছড়িয়ে আছে তারাপীঠের আকাশে-বাতাসে। গুরু বামের কথা ক্ষুদ্রমুখে কতটুকু আর বলি? যত বলি তত কম... "

আজকে বাবাঠাকুর নিজেই খালে কালভার্টে বসে কথা বলা শুরু করেছিলেন। আজ গুরুপূর্ণিমা, গুরুবচন করার তিথি। সাদা আলো থকথকে হয়ে জমে আছে বাবাঠাকুরের সাদা চাদর-ধুতিতে... যেন... যেন অপার্থিব লোক হতে তিনি নেমে এসেছেন আমাদের বোধ দেবেন বলে!

তখন আমি এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়াই। পিছনে পুলিশ লেগেছে। গ্রামে আমি থাকি না। শ্মশানে নদীর পাড়ে এই চলে যায় এইভাবেই হাওড়া, হাওড়ার পর বর্ধমান কোথাও থাকতে পারিনা। পায়ে হেঁটে উদ্ভ্রান্তের মতো এগিয়ে যাই আর যতটুকু পারি বিপ্লবের বার্তা নিয়ে যাই। এইভাবেই এসে পড়েছিলাম কেঁন্দুলি।

অজয়ের বিস্তীর্ণ চড়ায় তখন মেলা চলছে। আহামরি কিছু মেলা নয়। গুটিকয় মানুষ নিজেদের মতো করে গান-বাজনা করে এসে মেলা সম্পাদন করেন।"

বড়দা কইল, "জয়দেব কে দাদু?"

বাবাঠাকুর উদাস হয়ে কইলেন, "সে এক অদ্ভুত মানুষ। তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে পেয়েছিলেন। তার ভক্তির অনুভব এত গভীর ছিল যে, ঈশ্বর তাঁকে ধরা দিয়েছিলেন। জয়দেব গোঁসাই হলেন গীতগোবিন্দের রচয়িতা।

তোমরা বড়ো হবে জানবে বাংলার সাহিত্য ধরার মধ্যে একটি বিশেষ ধারা হল বৈষ্ণব পদ। জয়দেব গোঁসাই ওই বিশেষ ধারাটির রচয়িতা। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি মানুষটাকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তি আছে।

ওই স্থান তাঁর জন্মভিটা আর তাই মকর সংক্রান্তিতে ওখানে তাঁর স্মরণে মেলা বসে। মূলত সেই মেলাতে নাম সংকীর্তনই হয়।

দলে-দলে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ নাম সংকীর্তন করেন। এমন জায়গায় আমার গা ঢাকা দেওয়ার খুব সুবিধা ছিল। আমি গা ঢাকা দিয়েও ছিলাম। তারপর ওখান থেকে এক তীর্থযাত্রীর দলের সঙ্গ পাই। তাঁদের সঙ্গে গো-শকট ছিল। ব্রাহ্মণ সাধু-সন্ন্যাসী দেখে তাঁরা সেই শকটে ঠাঁই দিয়েছিলেন। গিয়ে পৌঁছেছিলাম সেই মহান ক্ষেত্রে।"

"কোথায় দাদা?"

"তারাপীঠং মহাপীঠং গন্তব্যং যত্নতঃ সদা। আমার মা তারার কাছে।" বাবাঠাকুর গান ধরলেন। ঠাকুরের গলা চমৎকার নয়, অদ্ভুত মিঠে-কষা ভাব আছে। আর তার সঙ্গে আছে আকুলতা। চোখ বুজে আকুল হয়ে গান ধরেন ঠাকুর। কণ্ঠনালী খেঁচে ওঠে, জল বেয়ে পড়ে চোখ দিয়ে... সমুখের প্রদীপ শিখা থরথর করে কাঁপিয়ে দেয় ব্যাকুলতা। বাইরের সারমেয় দল, একসঙ্গে ব্যাকুল হয়ে স্বর তোলে... বুকের ভেতরটা মোচড় দেয়।

"আমার মা ত্বং হি তারা
তুমি ত্রিগুণধরা পরা ৎ পরা
মা ত্বং হি তারা।
আমি জানি মা ও দীনদয়াময়ী
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা,
মা ত্বং হি তারা।

অন্ধকার নেমে আসছে সমুদ্রতীরে। এ কেমন বিপর্যয়, স্বয়ং আদিদেবও লুটিয়ে পড়ছেন!

মন্থনের এই পর্যায়ে সপ্তপাতালের শ্রেষ্ঠ সর্পকুলের গরলভাণ্ড উত্থিত হয়েছে। হলাহলের তীব্রতায় ছারখার হয়ে যাবে জগৎ। তাই আদিদেব ধারণ করলেন হলাহল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল কই! নীল হয়ে আসছে তাঁর শরীর।

পীড়িত মহেশ্বর স্মরণ করলেন সেই তাঁকে, সমস্ত জগৎসংসার যার স্নেহাস্পদ, সেই মা-কে। মা এলেন, এলেন তারিণী রূপে। আপন বক্ষসুধা পান করালেন মহেশ্বরকে, প্রাণ পেলেন মহাদেব। মা মহামায়া হলেন তারিণী তারা।

কিন্তু জগৎ যার করপুটতলে, সে-ই মা-ই পতীনিন্দা সহিতে পারলেন না। যজ্ঞপ্রাঙ্গণে মায়ের শরীর স্কন্ধে মহেশ্বর হলেন প্রচণ্ড। বিষ্ণু স্মরিলেন সুদর্শনকে... মায়ের প্রজ্ঞানয়ন তথা নয়নতারা এসে পড়েছিল বঙ্গদেশের এক শ্বেত শিমুল বৃক্ষের তলায়। কামাক্ষ্যা থেকে নেমে এসে ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠ জাগিয়ে গেলেন মায়ের অংশকে। মা, তারা রূপে অধিষ্ঠাত্রী হয়ে রইলেন, সেই বৃক্ষতলে।

তারপর বহু যুগ পেরিয়েছে। জয়দত্তের মৃত পুত্রকে বাঁচিয়ে গেছেন এক মেয়ে। বুঝলেন জয়দত্ত, এ আর কেউ নয়, মা স্বয়ং। কালো মায়ের স্নেহপরশে শুধু জয়দত্ত নয়, আমরা সবাই যে বাঁধা পড়ে আছি। মহুলা গ্রাম মা-কে বুকে নিয়ে জেগে রইলে।"

"জয়দত্ত কে দাদু?"

বাবাঠাকুর আবার কণ্ঠ ছাড়লেন। ঠাকুরের সঙ্গে আমরাও ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছিলাম— মা তারা কে? তিনি যেন নিজের মা-টি আমার... কীসের অমন ব্যাকুলতা?

"কাঙাল আমি ফিরি পথে,
নারায়ণীর প্রসাদ মাগি।
যুগে যুগে অন্তরেতে,
রহেন তিনি নিত্য জাগি।
কেউ বা তাঁরে মন্দিরে পায়,
কেউ বা দেখে গাছের ছায়ায়।
যেভাবে যে তাঁহারে চায়।
সেইভাবে র'ন তাঁরই লাগি।।

জয়দত্ত বণিকের গল্প, এক পিতার গল্প। অসহায় ভেঙে পড়া এক পিতা ডেকেছিলেন তাঁর মা-কে। একই

সঙ্গে পুত্র ও মাতৃলাভ করেছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে আমরা সবাই মা পেয়েছিলাম।

এ এক সন্তানের গল্পও বটে। সেই সন্তান যমের দুয়ার হতে ফিরে এসেছিলেন মাতৃআজ্ঞায়। আর তারপর তাঁর হাত দিয়ে মা এসেছিলেন সবার তরে।

হতভাগ্য বণিক জয়দত্ত বাণিজ্য করে ফিরছিলেন। পথে নৌকাতে তাঁর সন্তান দেহত্যাগ করে। সন্তানের মৃতদেহ বক্ষে নৌকা তখন দ্বারকার বুকে পড়েছে। আশ্বিনের চতুর্দশী তিথি। আগামীকাল মা লক্ষ্মীর পূজা। মা দয়াও করেছেন বিস্তর। বালাম, পদিগুলির খোলভরতি মোট। মণি, মুক্তা, জহরতের আলো ঠিকরে পড়ছে। কোথায় বাড়ি পোঁছে ধুমধাম করে মায়ের পূজা দেবেন, কিন্তু তাঁর বক্ষস্থল-ই যে শূন্য। জমাটবাঁধা আঁধার তাঁর অন্তঃস্তলে। কী বলবেন, তাঁর স্ত্রী-কে? আছড়ে পড়লেন ইষ্টের পদে।

দ্বারকাস্থিত চণ্ডীগড় শ্মশানের ঘাটে রাখা হল নৌকা। এ তো শুধু শ্মশান নয়, বিস্তীর্ণ অরণ্য। দূরে-দূরে অসংখ্য চিতে জ্বলছে। সব পার করে মহাশ্মশানের একেবারে প্রান্তে নৌকা রাখেন বণিক। পুত্রকে বিদায় জানাতে হবে।

এদিকে পিতার অঝোর ধারায় 'মা' ডাক নিঃশব্দে ছুঁয়ে দিয়েছে তাঁকে। এখানে যে তিনিই ঘুমিয়ে রয়েছেন কালাতিকাল জুড়ে। যাঁর বাম কোলে খোদ মহেশ্বর সন্তানরূপে নিশ্চিত আশ্রয় খুঁজেছেন। যাঁর স্তন্যে প্রাণ পান মহেশ্বর। সেখানে মৃত্যুর সাধ্যি কী, তাঁর দ্বার হতে, এক হতভাগ্য বাবার কোল হতে সন্তান কেড়ে নেয়? খোদ বশিষ্ঠদেব যাঁর সাধনা করে সিদ্ধি নেন, তাঁর সন্তান দুঃখে থাকবে এ হয় কেমনে?

সন্তানের কান্না মা-কে নাড়িয়ে দিলে। সুপ্তি ভেঙে মা তারা এলেন ষোড়শী কন্যা রূপে।

তাঁর ঈঙ্গিতে দিঘির জলে প্রাণ ফিরে পেল মৃত মৎস্য! বণিকরা শোলমাছ কেটে রেখেছিল রান্নার জন্য। কিন্তু এমতাবস্থার পর রান্না করা যায় না। তাই সেই মাছ দিঘির জলে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু দিঘির জল স্পর্শ মাত্র সে মাছ জীবন্ত হয়ে চলে বেড়াতে লাগল! অমনি সেই জঙ্গলে কোথা হতে এক ষোড়শী কন্যা উপস্থিত হয়ে বললে, 'এই জল মৃতকে জীয়ন্ত করে। এ জল প্রাণবারি।' বলেই সে কন্যা উধাও হয়। সে-কন্যাকে আর কেউ দেখতে পেল না।

অসহায় পিতা তাড়াতাড়ি পুত্রকে নিয়ে গিয়ে সেই পুকুরের জল তুলে স্নান করান। প্রাণ ফিরে পেয়ে উঠে বসে বণিকপুত্র।

সে-রাতে স্বপ্ন দিলেন সর্পবেষ্টিতা, নীলপদ্ম-শোভিতা, ত্রিনয়নী মা। শ্মশান মধ্যস্থিত শ্বেত শিমুল বৃক্ষতল হতে বণিক তুলে আনলেন মাতৃমূর্তি। খোদ বশিষ্ঠদেব আপন হস্তে জাগিয়ে ছিলেন মা-কে, তারপর কেটে গেছে বহু যুগ। আবার মা এলেন প্রকাশ্যে। প্রতিষ্ঠা হল তারাপীঠ।

সেই আশ্বিনের শুক্ল চতুর্দশী, তারা মায়ের আবির্ভাব তিথি।

যুগ বদলায়, সময় যায়। দ্বারকার জলে মায়ের কথা বয়ে চলে দূর দূর... বহু দূর। সাধক কমলাকান্ত আসেন। মায়ের পায়ে বসে গেয়ে যান গান। মা যে বড়ো একা। কিছুতেই শান্তি হয় না তাঁর। আর তাই বুঝি এলেন জমিদার জগন্নাথ রায়। এবার মা নিজেই মলুটি থেকে আনালেন তাঁর ছেলেকে। বামাচরণ তখন পরবাসী, মা টেনে নিলেন কোলে।

সাধককুল বলেন পঞ্চমুণ্ডি আসন খোদ মায়ের আঁচল, মা না চাইলে বসতে নারি। বামাখ্যাপাকে শ্বেত শিমুলের সেই বৃক্ষতলে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসতে দিলেন মা স্বয়ং।

প্রথমে ভয়ংকরী রূপে শাসনের বাঁধন দিলেন, তারপর মা হয়ে টেনে নিলেন বুকে। সে এক অমাবস্যার রাত, কালো

রাত। কিন্তু যে-রাতে মা দেখা দেন, সে-রাত কী কালো হতে পারে! কালো রূপ যে মায়ের আপনার অঙ্গরাগ। তাই ভাদ্রমাসের এক অমানিশাঘন অমাবস্যার রাতখানি উজ্জ্বল হয়ে রইল আজীবন... মা পেলেন এক সন্তান। বামাচরণ সাধক হলেন বামাখ্যাপা। মহুলা গ্রাম 'তারাপীঠ' নামে হল প্রসিদ্ধ।"

***

"তারাপীঠ দর্শনের পর আবার ফিরে চলেছিলাম অজয়ের দিকে। সমিতি দেখে খবর এসেছিল পদ্মা পার হতে হবে। রেলে করে জাগতি ও গোয়ালন্দ গিয়ে সেখান থেকে পদ্মা পার হতে হবে। ফিরে আসছি দ্রুত, ন্যারো রেলপথ ধরে সুরুল হয়ে, দামোদর ধরে এসে ফিরব— নাক বেড় দিয়ে কান ধরা যাকে বলে। কিন্তু সেইভাবেই খোঁজ পেয়েছিলাম এক মায়ের পূজার। এক সাহেব নাকি পুজো করতেন মা-কে! কলকাতার কবিয়াল ফিরিঙ্গিসাহেবের কথা জানতুম, এটা জানলুম দ্বিতীয় এক সাহেবের কথা...

এক সন্ধ্যায় সে-গ্রামে গিয়ে পৌঁছেছিলুম। সেখানে তখন পূজা বারোয়ারি হয়ে গেছে। ছুঁয়ে এসেছিলাম কুঠিবাড়ির সেই মাতৃপাট।

আমাকে আশ্রয় যিনি দিয়েছিলেন, তিনি স্থানীয় জমিদারের নায়েব। তাঁর পরিবার এই পূজার সঙ্গে লতায়-পাতায় যুক্ত। খেরোখাতা বের করে, পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া বিবরণী শুনিয়েছিলেন।"

।: সাহেবের পূজা :

"শাঁখের শব্দ শুরু হতেই সবাই দালানে এসে জমা হলেন। শরতের পিতলরঙা চকচকে রোদ এসে দালান ছুঁয়েছে।

ঢাকের শব্দে গমগম করে উঠল। ধীরে-ধীরে নতুন বস্ত্র পরা কৌতূহলী মানুষের সার পড়ল। যেন এক মস্ত সৈন্যদল কুচকাওয়াজে বেরিয়েছে। এরা কিন্তু সবাই গ্রামের মানুষ! আর তাদের থেকে একটু দূরে, আড়ালে কুঁচি দিয়ে কাছা করে ধুতি পরা এক সাহেব! চক্ষু মুদিত, হাত জোড়করা! মুখখানা দেখলেই বোঝা যায়, তাতে কোনো মেকি ভক্তি নেই, বরং তার ভক্তি অন্তর থেকে উঠে আসা এক গভীর বিশ্বাস।

চিক্ বাহাদুর ছিলেন এক অন্যরকম কুঠিয়াল। তিনি এসেছিলেন সামান্য কেরানি হয়ে, কিন্তু ধীরে-ধীরে কোম্পানির অডিটর জেনারেল থেকে কমার্শিয়াল এজেন্টের পদে উন্নীত হয়েছিলেন, অর্থাৎ যিনি সফলভাবে ব্যাবসা করে, নিজের ও কোম্পানির মুনাফা করবেন।

বীরভূমের সোনামুখি হল তাঁর ক্ষেত্র আর শান্তিনিকেতনের কাছে সুরুল নামক স্থানে করলেন কুঠি। কুঠিয়াল হয়ে তো গেলেন, কিন্তু তুলা, লাক্ষা, রেশম ইত্যাদি যে ব্যাবসাতেই তিনি হাত দিতে চান, সেখানেই সাফল্য যেন আর আসে না; যতই চেষ্টা করেন, কিছুতেই সফল হতে পারেন না।

সাহেবমানুষটা লালমুখোদের মতো অতখানি কড়া ছিলেন না। দেওয়ান শ্যামকিশোর সিংহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি মধুর ছিল। দেওয়ানই সাহেবের এই হতোদ্যম দশা দেখে দেবী দুর্গার আরাধনার প্রস্তাব আনেন। অদ্ভুতভাবে সাহেব রাজিও হয়ে যান, কারণ, বঙ্গদেশে তিনি দেবী দুর্গার প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা লক্ষ করেছেন। পূর্বতন সাহেবদের উদারভাবে জড়িয়ে পড়া, দানধ্যানও দেখেছেন। তাই রাজি হয়ে গেলেন।

শ্যামকিশোর সিংহ দ্রুত পূজার আয়োজন করলেন। চতুর্দিকে চাউর হয়ে গেল সাহেবের পুজোর কথা! কিন্তু শ্যামকিশোর

সিংহ এই পূজার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এই পূজাকে তিনি সর্বসাধারণের পূজা তৈরি করেছিলেন।

বাহুল্য বা জৌলুসের বদলে ভোজ ও সামান্য দানধ্যানের ব্যবস্থা করে সাহেবের পুজোকে আর দশটি পূজার থেকে আলাদা করে দিয়েছিলেন।

সাহেবের পূজায় মোট খরচ হত মাত্র পঞ্চাশটি টাকা। তার মধ্যে সতেরো টাকায় প্রতিমা, পুরোহিত প্রভৃতি খরচ আর বাকি তেত্রিশ টাকায় গ্রামের মানুষের নতুন বস্ত্র এবং ভজন সামগ্রী— এ-ই পুজো ছিল সর্বসাধারণের।

শোনা যায়, এরপর থেকে সাহেবের অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। তিনি একে মা লক্ষী, মা দুর্গার কৃপাবল বলেই মনে করেন; এবং এর পর থেকে যতদিন সাহেব বেঁচেছিলেন অর্থাৎ ১৮২৮ সাল অবধি, তিনি নিয়মিত সুরুলের কুঠিতে দুর্গাপূজার আয়োজন ভক্তিভরে করতেন। মহাষ্টমীর মহাভোজ খেয়ে তৃপ্ত হতেন মানুষ, সন্তুষ্ট হতেন দেবী।

তাই তো জন চিপস থেকে তিনি হতে পেরেছিলেন সাধারণের 'চিক্ বাহাদুর'।

খাতা বন্ধ করে ভদ্রলোক বলেছিলেন, বাবার মুখে শুনেছি নবকৃষ্ণ দেবের তোষামোদি পূজাকে নগর কলকাতার ভাবড় হিন্দুরা ভালো চোখে দেখতেন না। ব্যঙ্গাত্মক ছড়াও কাটা হত। বীরভূমের সমাজকাররা কী করতেন জানা যায় না, কিন্তু চিক্সাহেবের পূজা টিকে রয়েছিল প্রায় ত্রিশোর্ধ্ব বছর। তারপর তো সাহেব মারা গেলেন, আমরা সবাই রইলুম দায়িত্বে...

।। নারীর দশা - ইতুপুজা ।।

"ঢাক বাদ্যি করে কলরব, পালকিতে ওঠেন রাজেশ্বরী,
উলূধ্বনি, পুস্পবৃষ্টি রহে পড়ে পিছে,
কন্যারা ছাড়ি যায় বাপের নগরী।
ডাইনের পথ ধরে বড়, ছোট ধরে বাম,
এতদিনে দুই ভগিনীর ছাড়াছাড়ি হল ধাম।
ডানপার্শ্বে বাঁচে হাহাকার, আর্তস্বর, কাতর-অনুনয়,
বামপার্শ্বে সুজলা, সুফলা শস্যক্ষেত্র, বসুন্ধরা খুশীতে উছলায়।

অর্থাৎ, ছোটোবোন যে পথে যায়, সে-পথে শুধুই প্রাচুর্য আর বাহুল্য— কোথাও মানুষ ঝুড়িভরতি করে ধান নিয়ে চলেছে হাটে, কোথাও গরুর গাড়িতে করে স্বামী-স্ত্রী সন্তান কোলে উচ্ছল হয়ে চলেছে বাপের গৃহে, তো কোথাও গৃহে উৎসবের ছবি, দ্বারে মঙ্গলঘট, মাল্য। সে-পথে শুধুই হাসি— শিশু হাসে, মা হাসে, দোকানি হাসে, হাসে কৃষককুল।

একটি উৎসবগৃহের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গৃহস্বামী তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। সবাকার কোঁচড় ভরে দেন মায়ের প্রসাদী চিড়ে-মুড়কি। নিজের ও পালকি বাহকদের চিড়ে-মুড়কি-মণ্ডা ভাগ করে খেয়ে, খুশিতে পথ চলেন তাঁরা।

অন্যদিকে বড়োবোন যে পথ দিয়ে যান, সে পথে কেবলই বিভীষিকা! বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পথে দেখেন বাঘ একটি ত্রস্ত হরিণশাবককে তাড়া করেছে। নগরের পথে

দেখেন মৃতদেহ ঘিরে তার পরিজনের কান্না। হাটের পাশে দেখেন জনহীন দোকান আর দোকানের কপাল চাপড়ে কান্না। কৃষিক্ষেত্রে পঙ্গপালের উচ্ছ্বাস! ফলন্ত জমি, ফলফলে ধান সব কিছু তাদের কালো-সবুজ ডানায় ছেয়ে গেছে। কৃষক বুক চাপড়ে আর্তনাদ করছে। তার শিশু দুধের অভাবে কাঁদছে, গোয়ালে সার-সার ধসারোগে আক্রান্ত গরু।

কান্না, মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ এ-সব দেখেই পথ পার হতে হয় তাঁকে। এমনধারা ঋণাত্মকতা তাঁকে প্রবলভাবে যন্ত্রণা দেয়। দারুণ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে বাকি পথ দেখার সাহস হয় না তাঁর। পালকির মধ্যে গুটিয়ে-সুটিয়ে বসেন।

***

আমরাও গুটিসুটি মেরে বসি। চ্যাড়া গলে হেমন্তের শিলোনো বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। বাবাঠাকুর এমনধারা ফাঁকা-ফাঁকা ঘরে কেমন করে র'ন কে জানে! খালের দখিনমুখী এই ঘর।

উত্তুরে হাওয়া এসে, খালের ঠান্ডা জলে গা ধুয়ে সেই ভিজে গায়েই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাই তো এই সামান্য হেমন্তেই মাঝে-মাঝেই আমাদের দাঁতকপাটি লেগে যায়। নেহাত বাবাঠাকুর ওই ছোট্ট স্টোভটিতে মাঝে-মাঝে চা দেন।

আমরা শীতে উশখুশ করছি দেখে বাবাঠাকুর উঠে গেলেন। বুঝলাম, আবার একবার চা চড়াতে গেলেন। এইবেলা আমরা আজকের প্রসঙ্গটি বলি। অগ্রহায়ণ শেষ হয়েছে বলে আজকে বাড়িতে ঘটবাড়ি পুজো। আজকের খাওয়াটিও বিশেষ হয় বাড়িতে— আতপ চালের ভাত, মুলা দিয়ে মুগের ডাল আর লাল টুকটুক আলুমাখা।

এইদিনে এরূপ অদ্ভুত খাবারের কী কারণ সেইটে বাবাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাইতেই তিনি খুলে বসলেন তাঁর জ্ঞানের ঝাঁপি...

"একদা এক নগরে অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস করত। সামান্য কয়েক ঘর জজমানি আর একফালি বসতবাটি— এ-ই ছিল তার সাকুল্যে। ব্রাহ্মণের খুব ইচ্ছে ছিল তার পুত্রসন্তান হোক। তাহলে বাপ-বেটায় খেটে খানিকটা আর্থিক স্বচ্ছলতা আসবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাদের ঘর আলো করে এল দুই কন্যা। সে-কাল ছিল বড়োই খোজা কাল। কন্যা মানেই বিবাহ, পণ... আর কুলীন হলে কুলীনত্ব বজায় রাখার খরচা। ব্রাহ্মণ চরম অবহেলায় কন্যাদের নাম রাখলেন উমনো-ঝুমনো।

মেয়েরা বড়ো হয়। রূপের ছটায় ভরে যায় দিকবিদিক। মেয়েদুটো তেমনই লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে, কিন্তু তবুও ব্রাহ্মণের আর মন ভরে না। কথায়-কথায় মেয়েদের খুঁত ধরে। ব্রাহ্মণী অবশ্য অতখানি অবহেলা করতে পারে না মেয়েদের। কিন্তু তাতে অবস্থা কিছু শুধরায় না। ব্রাহ্মণ সব সময় মনে-মনে প্যাঁচ কষে কীভাবে মেয়েদের বোঝা ঘাড় থেকে নামানো যায়।

এরই মধ্যে ব্রাহ্মণের একদিন পিঠে খাওয়ার শখ হল। যজমানবাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে আতপ চাল, গুড়, নারকেল জোগাড় করে আনল।

ব্রাহ্মণী পিঠে করতে বসে। আর ব্রাহ্মণ পাশের ঘরে বসে দড়িতে গিঁট দেয়। একটা করে পিঠে আর একটা করে গিঁট। রাতে খাওয়ার সময় বসে দেখা যায় দুটি পিঠে কম!

ব্রাহ্মণ ঠিক বুঝে যায় এই পিঠে তার দুটি মেয়ে খেয়েছে। মাথায় আগুন জ্বলে যায় তার— ব্রাহ্মণ হয়ে ভিক্ষা করে পিঠের সামগ্রী জোগাড় করে এনেছে। আর তার মেয়েরা তার খাওয়ার আগেই অনুমতি না নিয়ে সেই পিঠে খেয়েছে!

সেইদিনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় ব্রাহ্মণ। মেয়েদের বলে, কাল সকালে সে তাদেরকে পিসির বাড়ি নিয়ে যাবে। সে বড়ো গরিব কিন্তু তার বোন-ভগ্নিপতি মস্ত ধনী। তাই এতদিন সাহস করে কিছু নিয়ে যেতে পারেনি। তাই, কাল পিঠে নিয়ে এসে বোনের বাড়ি যাবে। সঙ্গে নিয়ে যাবে দুই মেয়েকে।

সকালে ব্রাহ্মণীর চোখের জল মানে না। বিলক্ষণ জানত যে, তার কোনো ননদ নেই। কিন্তু কিছু মুখ ফুটে বলতে পারল না। স্বামীর মেজাজ সে ভালোই বুঝত।"

বড়দা কইলে, "ঠাকুর, উনি তো মা! মা তো বুক দিয়ে আগলায়। তুমিই তো বল।"

"বঙ্গদেশের নারীদের এটাই ছিল দুর্দশা— তাদের বুক ফাটত, তবু মুখ ফুটত না। রক্তমাংসের মা যখন পারে না, তখন এই মা, আমার পাষাণ-বেটি আসেন। সেই কাহিনিই তো বলব।

তো যা বলা, মেয়েদুটিকে নিয়ে বাবা অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হল। পথশ্রমে ক্লান্ত দুই মেয়ে বিশ্রামের সময় বাবার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর সেই সুযোগে হতভাগা ব্রাহ্মণ মেয়েদেরকে রেখে পালিয়ে গেল। যাওয়ার আগে, কয়েকটা শামুক কুড়িয়ে, ভেঙে, তাদের মাংসগুলো ছড়িয়ে, সঙ্গে করে আনা আলতা ছিটিয়ে দিয়ে গেল। যাতে মেয়েরা ভাবে যে তাদের বাবাকে বাঘে নিয়েছে। কিন্তু মেয়েরা অত বোকা নয়, তারা ঠিকই বুঝতে পারল এগুলো মানুষের মাংস নয়। সেই সঙ্গে এ-ও বোঝে, তাদের বাবা তাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। দুই বোন কাঁদতে-কাঁদতে বনের পথে ঘোরে।

মানুষের কান্না শুনে এবার সত্যিকারের বাঘ আসে। অসহায়া তারা পথ পায় না, শেষে যে বটগাছের তলে তারা দাঁড়িয়ে ছিল, সেই বৃক্ষদেবতাকেই নমস্কার করে বললে,

"ঠাকুর, আমরা বড়ো অভাগা। তুমি তো সবাইকে আশ্রয় দাও। আমাদেরকেও আশ্রয় দাও।"

বৃক্ষদেবতা সেই আকুতিতে চুপ থাকতে পারলেন না। নিজের কোটর ফাঁক করে তাদেরকে আশ্রয় দিলেন। বন্ধ বৃক্ষকোটরে তারা সুরক্ষিত রইল। বাঘ চলে গেলে দুই বোন কোটর থেকে বেরিয়ে আঁজলা করে গাছের গোড়ায় জল দিয়ে, প্রণাম করে যায়। বৃক্ষদেবতা শাখাভরা আশীর্বাদ দেয়। উমনো-ঝুমনো আবার পথ চলে।

পথ চলতে-চলতে তারা এসে পড়ে এক গ্রামে। সেখানে তখন শাঁখ, কাঁসি— মস্ত হুলুস্থুল। মেয়েরা পুকুরপাড়ে ছোটো-ছোটো ঘটে জল ভরে। দুই বোন কৌতূহলী হয়ে পাশে দাঁড়ায়, অমনি সেই ঘট উলটে যায়। সবাই তো এই মারে কি সেই মারে... এরা নিশ্চয়ই অলক্ষ্মী, নাহলে এমনধারা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে কেন?

দুই বোন তাদের দুঃখের কাহিনি শোনায়। নরম হয় মেয়েরা। বলে, 'স্নান করে এসো। আমরা এখানেই মা ইতুলক্ষ্মীর পূজা করছি। আমাদের সঙ্গে পূজা করো। মা সব ঠিক করবেন।'

হায় রে কপাল, দুই বোনে পুকুরে নামে। অমনই ভরা দিঘির জল মুহূর্তে শুকিয়ে যায়। লাফালাফি করে মাছ। ভয়ে দুই বোন উপরে উঠে আসে। তারা কী তাহলে সত্যিই অভাগা, অপয়া, অলক্ষ্মী?

সমবেত মেয়েরা কইল, 'মা অমন পরীক্ষা নেন। সম্মুখে তোমাদের অনেক ভালো আছে। তাই মা এমন করে পরীক্ষা নিচ্ছেন। মা-কে স্মরণ করে আমাদের ঘটের এই দূর্বাজলটুকু ছিটিয়ে দাও দেখি, দেখবে সব ঠিক হবে।'

ঘটের দূর্বা নিয়ে দুই বোন ছড়িয়ে দিলে সে পুকুরের মাটিতে। শুকনো খটখটে সেই দিঘির বুকে জল এল। ছলাৎ-ছলাৎ ধাক্কা মারে পৈঠায়...

দুই কন্যা দিঘির জলে স্নান সেরে পূজো করতে বসে। মেয়েদের শেখানো মন্ত্র পড়ে ভক্তিভরে পূজা সারে মায়ের।

অষ্ট চাল অষ্ট দূর্বা কলস পাত্রে থুয়ে।
শুন একমনে ইতুর কথা সবে প্রাণ ভরে।
ইতু দেন বর।
ধন-ধান্যে, পুত্র-পৌত্রে বাড়ুক তাদের ঘর ॥

কাঠি-কুটি কুড়াতে গেলাম।
ইতুর কথা শুনে এলাম।
এ কথা শুনলে কী হয়?

নির্ধনের ধন হয়।
অপুত্রের পুত্র হয়।
অশরণের শরণ হয়।
অন্ধের চক্ষু হয়, আইবুড়োর বিয়ে হয়।
অন্তিম কালেতে স্বর্গে যায়।।

মা-বাবা তাদের বোঝা ভেবে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু তা বলে কি তারা কুসন্তান হতে পারে? পূজা সমাপনে প্রথমেই ইতু মায়ের কাছে চেয়ে নিল বাবা-মায়ের অক্ষয় আয়ু আর সংস্থান।

ইতু মা-ই তাদেরকে পথ দেখিয়ে সাবধানে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। মায়ের জলপূর্ণ ঘট মাথায় নিয়ে তারা বাড়ি পৌঁছাল। ব্রাহ্মণ তাদের দেখে তো অবাক! ভেবেছিল মেয়েদের বাঘে খেয়ে নিয়েছে...

এখন সব শুনে ভীষণ অপরাধবোধে দুই মেয়ে আর ইতু মায়ের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নেয়। মেয়েদের পূর্ণ সম্মান দিয়ে ঘরে গ্রহণ করে।

দিন যায়, কাল যায়; অগ্রহায়ণের প্রত্যেকটি রবিবার পূর্ণ নিয়ম মেনে, নিরামিষ আহার করে তারা ইতুপূজা করে।

দুই মেয়ে একদিন ঘাটে কাপড় কাচে। সেই পথ দিয়ে রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র যায়। বড়োবোন উমনোকে দেখে ভারি পছন্দ হয় রাজার ছেলের।

জল মাগে তৃষ্ণা মেটাতে,
ছোট ভাণ্ড এনে জল দেয় তাতে,
অবাক হয়ে রাজপুত্র ভাবে, মস্করা নাকি এবে,
এতজন এইটুকু জলে বা কী হবে?
খেতে গিয়ে বোঝে এ ভাঁড় সাধারণ নয়,
যত জল খায় নাহি সে জল ফুরায়।

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র সবার তেষ্টা মিটিয়ে, সে ভাণ্ড অক্ষয় থাকে। রাজপুত্র বোঝে এই নারী সাধারণ নয়। ইনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এঁকেই তার রাজ্যের রানি করতে হবে।

যেমন ভাবা, ব্রাহ্মণের কাছে হাত মাগে মেয়ের। ব্রাহ্মণ ইতস্তত করে। রাজপুত্র অবাক হয়। সে রাজ্যের রাজপুত্র, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! তার হাতে মেয়ে দিতে ব্রাহ্মণের কীসের এত অসুবিধা?

ব্রাহ্মণ খোলসা করেন। তার দুইটি কন্যা, ফলে যদি তারা দুইজনে দুটি কন্যাকেই গ্রহণ করে, তাহলে বড়ো ভালো হত। সেইমতো রাজপুত্র এবং মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়ে যায় উমনো-ঝুমনোর।

ব্রাহ্মণী আসে কন্যা বিদায় করতে, বড়োমেয়ে আবদার করে, মায়ের হাতের ভাত আর মাছের ঝোল খেয়ে তবেই সে বিদায় নেবে। সে এখন রাজরানি, তার বিদায়টাও রাজরানির মতো হওয়া উচিত।

এদিকে ছোটোমেয়ে অগ্রহায়ণের রবিবার নিরামিষ খায়। সামান্য ফলাহার করে ইতু মা-কে স্মরণ করে তাঁর ঘট নিয়ে পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিল ঝুমনো।

তারপরের কাহিনি তো আমরা সবাই জানলাম।"

এর মধ্যে আমাদের চায়ের কাপটিও এসে পড়েছিল। চুমুক দিতে দিতে পরবর্তী আখ্যানের জন্য আমরা অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

বাবাঠাকুর বলা শুরু করলেন, "মানুষের যখন নিশ্চয়তা আসে, তখন মানুষ তার অতীত ভুলে যায়। আর তখনই সে অধঃপতিত হয়। মনে রেখো, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কর্মই পূর্ববর্তী কর্মের উপর নির্ভরশীল। অন্যায় করে এসে সহস্র নামজপেও মুক্তি মিলবে না। অন্যায়ের দণ্ড ভোগ করতে হয়।

কিন্তু এই সহজ সত্যটা ভুলে গিয়েছিল বড়োমেয়ে উমনো। যাত্রাপথের ওই ভয়ংকর দৃশ্যও তার মনে একবারের জন্যও প্রশ্ন তোলেনি। রাজরানী হয়ে মিথ্যা গরিমার অহংকারে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটি দিনের তরে সুখ পেল না সে। যেদিকে তাকায় সেদিকে শুধুই হাহাকার। তার অমন সুন্দর রাজ্য দু'দিনে শুকিয়ে গেল, দিকে-দিকে প্রজাদের আর্তচিৎকারে কান পাতা দায় হল।

অন্যদিকে মন্ত্রীর ঘরে তখন সুখের সংসার। ঐশ্বর্য, ধন, মান কম, কিন্তু শান্তি বিরাজ করে। ছোটোবোন ঝুমনো নিয়মিত পূজার্চনা করে। ইতু মা-কে ভক্তিভরে স্মরণ করে।

নিজের স্ত্রীকে সর্বক্ষণ অসহ্য, অলক্ষ্মী বলে মনে হতে লাগল রাজপুত্রের। সে জল্লাদকে নির্দেশ দিল তার পত্নীকে হত্যা করার, কিন্তু জল্লাদ একজন রমণীকে হত্যা করতে পারল না। তাই তাকে ছেড়ে দিয়ে এল বনের প্রান্তে।

বোন ঝুমনো ঠিক খবর পেয়েছিল। দিদিকে নিয়ে এসে নিজের গৃহে লুকিয়ে রেখেছিল। দুই বোন আবার একসঙ্গে মায়ের পূজা করত। আস্তে-আস্তে করে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় নিজের মনের সবটুকু অন্ধকারকে দূর করে আলোকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল উমনো।

ওই যে বলেছিলাম না, মা তো মা-ই হন, ইতু মা রাজমাতাকে স্বপ্ন দিলেন যে, তিনি যদি তাঁর পুত্রবধূকে ফিরিয়ে না আনেন, তাহলে রাজ্যের অবস্থার উন্নতি অসম্ভব।

এইভাবে ফিরে এল বড়োবোন রাজরানি হয়ে, তবে সে আর ভুল করল না। ভক্তিভরে মায়ের ঘট স্থাপন করল দুই বোনে। পরমভক্তিতে অগ্রহায়ণ মাসে মায়ের পূজা করল। কিন্তু ইতু মায়ের পূজা সমাপনে মায়ের ব্রতকথা শ্রবণ করতে হয়। এদিকে গোটা রাজ্যে একটিও উপবাসী স্ত্রীলোক নেই। উপোসি স্ত্রীলোক বিনে এ-কথা শ্রবণ করা যাবে না। হেনকালে খোঁজ পাওয়া গেল এক বৃদ্ধ হাঁড়িনী মায়ের। সেই হাঁড়িনী মা ও তাঁর সন্তানদের শাস্তি দিয়েছিল রাজপুত্র। হাঁড়িনী মা ছেলে হারিয়ে কেবল কাঁদেন, অন্ন দিতেন না মুখে।

আজ সেই মা-কেই ডেকে আনা হল পরম সমাদরে। সেই মায়ের কানে দেয়া হল ইতু মায়ের মন্ত্র। প্রাণ ফিরে পেল সন্তান। আলোয় ভরে গেল তাঁর ঘর। মায়ের ব্রত ধুমধাম করে প্রচার পেল নগরে-নগরে।

কথা কী জানো দাদুভাইরা, মা সব খেয়াল রাখেন। কিন্তু শিশু না কাঁদলে দুধ খাওয়ান না। আপন চাহিদাটুকু বোঝাতে হয়। ওইটেই হল সাধন। এর সঙ্গে সংস্কার-কুসংস্কার নেই, ভাই।

মা লক্ষ্মী অভিমান করে চঞ্চল হয়ে যেমন সন্তানের ভরা গৃহ পরিত্যাগ করেন, তেমনই সন্তানের কাতর প্রার্থনায়

আকুল হয়ে তার অস্থিসার দেহপাটে ওমকার দিয়ে তাকে প্রাণিত করেন; উজ্জীবিত করে তোলেন।"

: বিধি :

"অগ্রহায়ণ মাসের প্রত্যেক রবিবার এই পুজো করে অগ্রহায়ণের সংক্রান্তির দিন পুকুর, নদী বা গঙ্গায় ইতু বিসর্জন দিতে হয়। কুমারী ও সধবা সকলেই এই ব্রত করতে পারে।

কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন, একটি বেশ পরিষ্কার সরার মাঝখানে ঘট বসিয়ে তার চারিদিকে ধান, হলুদ, মান ও কচু গাছ একটা করে বসাতে হবে। মটর, সরষে, শুষনি, কলমী আর পাঁচটি ছোটো বটের ডাল দিতে হয়। পুজোর শেষে উপরোক্ত মন্ত্রটি বলে ঘটে প্রণাম করার নিয়ম।

ঘটের উপকরণ— সিঁদুর, ফুল, দূর্বা, বেলপাতা, তিল হরিতকি, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, শিয়াকুল এবং ফল।

আর এই কারণেই এই বিশেষ দিনে নিরামিষ খেতে হয় নতুবা আমিষ খেলেই অবস্থাটি কিন্তু..."

বাবাঠাকুরকে এই কথা শেষ করতে হল না। আমাদের বড়দা তার আগেই বলে উঠল, "উমনো-ঝুমনোর দশা হয়।"

।। চৌদ্দশাক- চৌদ্দদীপ কথা ।।

ঠিক দুক্কুর বেলা, ভূতে মারে ঢ্যালা...

খসখস শব্দটা পাচ্ছি... আর দেখতে পাচ্ছি ওই আবছায়া অবয়ব। বিকালের ধোঁয়াভাবের সাদা গলায় কাচা কাপড়ের ভাঁজে-ভাঁজে জমে গিয়ে অদ্ভুত এক আলোছায়া। নীচু হয়ে কী যেন করছে অবয়ব!

রামনাম নিতে-নিতে এক পা, দু'পা করে পিছু হটছি। হাতুড়ি পিটছে বুকের ভেতর।

ভৌ!

আচমকা ডেকে উঠল একটা কুকুর। আর অমনি "বাবা গো! মা গো!" বলে জড়াজড়ি করে দু'জনে পুকুরে পড়লাম। খাবি খেতে-খেতে দেখলাম, সাদা কাপড় পরা সেই ভূত পিছন ফিরেছে। তিনি আর কেউ নন, আমাদের বাবাঠাকুর!

বাবাঠাকুরের দেওয়া ধুতি পরে, ধুনির আগুনের সমুখে বসে আগুন সেঁকছিলাম। অবেলায় জলে পড়া, তা-ও এই শীত-আগা কাত্তিকে... ভাগ্যিস চাদরগুলো ওদের হাতে দিয়ে এসেছিলাম!

ঘটনাটা হল, আমি আর দাদা দু'জনে প্রাণ হাতে করে বাঁশপোতায় ঢুকেছিলাম। সামান্য আওয়াজ হয় আর আমরা দু'জনেই চমকে উঠি। এতক্ষণ তবু পিছনে ওদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। এখন সব চুপ— নিস্তব্ধ, নিথর। শুধু ঝিঁঝিঁর জঁ-জঁ ডাক। বিলডাঙার এই বাঁশবাগান দিনের বেলাও খুব একটা লোকজন মাড়ায় না। এই বাঁশবাগানের ভিতর

ডোবাপুকুর আর পুকুর পেরোলে টানা জঙ্গল সেই বড়োরাস্তার পিছন অবধি গিয়ে উঠেছে।

ফি বছর এইখানে আমাদেরকে পাঠানো হয়। মানে আমাদের পাঁচ ভাইকেই পাঠানো হয়। আমাদের পাঠানো হয় ওল আর কালকাসুন্দের পাতা জোগাড় করে আনার জন্য। চোদ্দোশাকের আগে এই দু'টি ব্রাত্যপ্রায় পাতা জোগাড়ের দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে পড়ত। কারণ, আমরা হচ্ছি ব্যাটাছেলে।

ঠাকুমা বলতেন, "ভূত আমার পুত, পেত্নি আমার ঝি/ রাম-লক্ষ্মণ সঙ্গে আছে ভয়টা আমার কী?— এই বলতে বলতে তোরা পাঁচ ভাই মিলে জঙ্গল থেকে একছুটে নিয়ে চলে আসবি।"

কিন্তু বাস্তবে দেখা যেত জঙ্গলের দোরগোড়ায় এসে আমাদের বাকি তিন ভাই থমকে দাঁড়িয়ে যেত, হারুচাচার হেলে বলদটার মতো। তাদেরকে নড়ায় তখন কার সাধ্যি! বাধ্য হয়ে আমাকে আর বড়দাকেই (যেহেতু আমরা বয়সে বড়ো) ওই বাঁশবাগানে ঢুকতে হত।

আজও তা-ই ঘটেছিল। হিসাব পুরো কষা— পুকুরপাড় থেকে ওলের পাতা, কালকাসুন্দে কাটব নরুন দিয়ে, কেটেই দু'জনে হাত-ধরাধরি করে ছুট মারব। কিন্তু তার আগেই...

বাবাঠাকুর গুড়-চায়ের গেলাস এনে রাখলেন। বাড়িতে এ-জিনিস কেউ আমাদের চাখতে দেয় না। চুমুক মেরেই জিভ গেল পুড়ে। সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ঠাকুর কইলেন, "কোনো সংস্কার যখন দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকে, পরিমার্জন হয় না।, তখন অনেক ক্ষেত্রেই সেই 'সংস্কার' 'কুসংস্কারে' পরিণত হয়। মানুষের মনে সেই সংস্কারের উপর পরতে-পরতে নিজ-আরোপিত বিশ্বাস জমা হয়ে আড়াল করে দেয় আসলটিকে। তোমাদের এই ভূত চতুর্দশী আর চৌদ্দশাকও তা-ই।"

জানতুম যে, বাবাঠাকুর কুসংস্কার পছন্দ করেন না। কিন্তু এবার বাধ্য হয়ে মুখ খুললাম। দোষখানা বড়দারই, বড়দার মামার বাড়ি সুন্দরবনের নয় নম্বর লাটে। সেখান থেকে প্রতি বছর জেঠিমার দাদারা মস্ত-মস্ত মাছ-কাঁকড়া নিয়ে আসেন। পরশুদিন মামাবাবু এসেছিলেন। তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভয়ংকর গল্পখানা বের করেছে বড়দা। মামাবাবু দিদির বাড়ি এসে ভাগনা-ভাগনিদের নিয়ে বৈঠকখানায় শুতেন। ফরাস পেতে একখানা লম্বা বিছানা করা হত। সেখানেই তিনি গল্প শোনাতেন। পরশু রাতে আমার বাদবাকি ভাইরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমরা তিন ভাই এই গল্পটা শোনার পর বিছানায় প্রস্রাব করার মতো অবস্থা করে ফেলেছিলাম। তারপর আজকে আবার শাক তোলার ব্যাপার।

বাবাঠাকুর কইলেন, "কীসের কাহিনি শুনেছ?"

আমি তাড়াহুড়ো করে উত্তর দিলুম, "ভিতরঘর পুজো। সুন্দরবন সংলগ্ন চব্বিশ পরগনায় প্রাচীন সম্প্রদায়ের হাতেগোনা মানুষরা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে ভিতরঘর পূজা করে থাকে।

'ভিতরঘর' মানে পবিত্র ঘর। ওই ঘরে পূর্বপুরুষের আত্মাকে ধরে রাখা হয়। বাড়িতে কেউ মারা গেলে প্রথমে মৃতদেহের ছায়াটিকে ওই নির্দিষ্ট ঘরে ফেলা হয়। সঙ্গে মন্ত্র পড়তে-পড়তে আত্মাকে ওই ঘরে বেঁধে ফেলা হয়।

তেরোদিন পর ঘাটকার্যের আগে সেই ঘরের দাওয়ায় বা ছাঁচের একধারে বালি ছড়ানো হয়। রাতেরবেলা ওই বালির উপর দিয়ে ইঁদুর, সাপ বা টিকটিকি ইত্যাদি কোনো প্রাণী হেঁটে বা বেয়ে গেলে, বালির উপর সেই চিহ্ন রয়ে যায়।

মৃতের স্বজনরা বিশ্বাস করেন যে, মৃত ব্যক্তিই সেই প্রাণীর রূপ ধরে বালির উপর দিয়ে ঘরে এসেছিলেন। এরপর

সেই বালি কুড়িয়ে কলসে করে ভিতরঘরে রেখে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রতি বছর আষাঢ় মাসে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে এই ঘরটিতে ভিতরঘর পূজা দেওয়া হয়। পূজার দিন নাকি বলিও হয়! এবার বলো, এইসব শুনে ভয় লাগবে না?"

বাবাঠাকুর কইলেন, "যা কিছু হারিয়ে যায়, যা কিছু পুরাতন হয়ে যায়, তা-ই অতীত। আর অতীত মানেই ভূত। অন্যদিক দিয়ে ধরলে, পঞ্চভূতে তৈরি শরীর যখন আবার পঞ্চভূতেই বিলীন হয়ে যায়, তখন তা ভূত। এই যে ভূত চতুর্দশীর সঙ্গে স্বর্গ-নরকের দুয়ার খুলে যাওয়া— এই সমস্ত তত্ত্বের কতখানি সংযোগ আছে তা বলা মুশকিল। তবে বছরের এই নির্দিষ্ট সময় পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা তার উত্তরপুরুষদের জন্য বেঁধে দেওয়া এক নিয়ম। দীপ তত্ত্বে আসি।"

: চৌদ্দদীপ :

"কার্তিক মাস মূলত দীপ দানের মাস। সৌর কার্তিক থেকে মুখ্য ও গৌণ চান্দ্র কার্তিক মাস সবটা জুড়েই চলে এই রীতি। দুর্গাষ্টমী থেকে রাস পূর্ণিমা অবধি এই দীপদানবিধিগুলো হয়। বছরের অন্য কোনো সময়ের পূজা বা কালীপূজায় কিন্তু এমন দীপদানবিধি বাধ্যতামূলক নেই।

কার্তিক মূলত পিতৃপুরুষের মাস। চলতি কথায়— 'মৃতের মাস' অর্থাৎ স্বর্গত পিতৃপুরুষদের জন্য আকাশদীপ দান, অপহত পরিজনদের জন্য উল্কাদান— সবই এই মাসে। এই মাসের প্রধান কৃত্যই দীপদান। আর যে-কোনো দেবগৃহে ও দেবতার উদ্দেশে পুজোয় এ-মাসে ঘৃত বা তিল-তেলের দীপদানে দেবপ্রীতি ও পিতৃ পরুষের উদ্ধার ও আশীর্বাদ লাভ হয়।

কাজেই ভূত অর্থে গত হয়ে যাওয়া বা অতীত পিতৃপুরুষ। গোটা কার্তিক জুড়ে যত দীপ দান করা হয়, কার্তিক মাসের শেষে সমস্ত দীপগুলিকে কলার ভেলায় সাজিয়ে প্রজ্জ্বলিত করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সে এক অপূর্ব মনোরম দৃশ্য। একে বলা হয় 'আলো সারা'। কার্তিকের শেষের দিন তো আর ভূত আসে না? তাহলে এমন করার কারণ কী?"

বড়দা বলল, "স্মৃতি তর্পণ?"

"হ্যাঁ, পূর্বপুরুষের পরিশ্রম, তাদের ত্যাগ এই সংসারের প্রতি তাদের আত্মবলিদান— সব কিছুকে স্মরণ করা হয়, ঠিক এইভাবেই। হয়তো প্রতিদিনই মনে করি, প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁরা আসা-যাওয়া করেন স্মৃতিতে। তবুও এই একটা দিন বা একটা মাস কেবল তাঁদের জন্যই থাকে। তাই ভায়েরা, আর ভয় পেয়ো না।"

"আর শাক?"

: চৌদ্দশাক :

ভূত-প্রেত ইত্যাদিকে ধর্মের আড়ে বেঁধে দিয়ে বাধ্যতামূলক ও প্রতীকীরূপে করে দেওয়া হলেও মূল কথা হল দুইটি—

এক- এই চোদ্দোপ্রকার শাকের আবাদ, বহতা কৃষিপ্রধান সংস্কৃতিকে ইঙ্গিত করে। এই চোদ্দোটি ভিন্ন প্রকারের, ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত শাকের সহজলভ্যতা পক্ষান্তরে সুন্দর-সুগঠিত কৃষিব্যবস্থাকেই ইঙ্গিত করে।

অর্থাৎ এই চোদ্দোশাককে সহজলভ্য করতে হলে আমাদের কৃষিব্যবস্থার প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। ধরিত্রীর যত্ন নেব আমরা।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই সমস্ত শাকগুলি

মাটিতে নাইট্রোজেনের উপাদান বাড়ায়। ফলে মাটির উর্বরতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

দুই- কার্তিক মাসের ঋতু পরিবর্তন হেতু সমস্যা যেমন, শ্লেষ্মা, অগ্নিবৃদ্ধি, আড়ষ্টতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে রোগপ্রতিরোধের দেয়ালটিকে সুদৃঢ় করা। এ-ছাড়াও, কার্তিক মাস হল চৌকাঠ। এটি পেরিয়ে গেলেই চারমাসের লম্বা শীতকাল। তাই সেই সময়ের সঙ্গে লড়াই দেওয়ার জন্য শরীরকে আগাম পোক্ত করাও অন্যতম।

তাই শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট দিনেই চোদ্দোশাক নয়, বরং মাঝেমধ্যে গ্রহণ করাকেই পক্ষান্তরে ইঙ্গিত করা হচ্ছে।"

: শাক পরিচয় :

"ওলং কেমুকবাস্তুকং সার্ষপঞ্চ নিম্বং জয়াং।
শালিঞ্চিং হিলমোচিকাঞ্চ পটুকং শেলূকং গুডুচীন্তথা।
ভন্টাকীং সুনিষণ্ণকং শিবদিনে যদন্তি যে মানবাঃ প্রেতত্বং ন চ
যান্তি কার্তিকদিনে কৃষ্ণে চ ভূতে তিথৌ।"

—কৃত্যকৃত্ত্ব/রঘুনন্দন

শ্লোকটি মূলত চৌদ্দশাকের নাম ও তত্ত্ব। শ্লোকে উল্লেখিত চৌদ্দশাক-

১. ওল ডাঁটা
২. কেঁউ
৩. বথুয়া
৪. কালকাসুন্দে
৫. সরষে
৬. নিম

৭. জয়ন্তী
৮. শালিঞ্চে বা শিঞ্চে
৯. গুলঞ্চ
১০. পটল বা পলতা
১১. শেলুকা
১২. হিলমোচিকা বা হেলেঞ্চা
১৩. ভাঁট বা ঘেঁটু
১৪. সুনিষণ্ণক বা শুষনি

আবাদের কথা মাথায় রেখে বঙ্গের অনাবাদি অন্যান্য শাকগুলিকেও গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন— আমরুল, কলমি, কুলেখাড়া, খারকোন বা ঘাটকোল, ব্রাহ্মী, ঢেঁকিশাক, নুনিয়া বা নুন খুড়িয়া, তেলাকুচা, দণ্ডকলস, গিমা, থানকুনি, কাঁটানটে বা খৈরাকাটা, কচু, ঘাগরা বা হাগড়া (বিষাক্ত), মালঞ্চ, কালমেঘ বা আলুই, বাসক, চুকোর বা টক ভেন্ডি , কস্তরী, মোরগফুল।

নাও, অনেক সন্ধে হল। এবার তোমরা গুটি-গুটি পায়ে ঘরের দিকে রওনা হও। নাহলে এবার লোকজন চিন্তায় পড়বে।”

।। অঘ্রাণের পালা : পার্বণ ও প্রকৃতি রক্ষা ।।

বাবাঠাকুর ভীষণ মনমরা হয়ে ছিলেন। আমরা এলুম, আমাদের জন্য গুড়-চা করলেন, অথচ নিজে খেলেন না। আমরা আজকের এই শীত-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে কাদা ভেঙে এসেছিলুম বাবাঠাকুরের গল্প শুনব বলে। অবশ্য আমাদের এই গ্রামে ভোটের পর রাস্তায় ইট পড়েছিল। গ্রামের ভিতরেও অতখানি কাদা নেই। কেবল বাড়ির সামনে, উঠোনগুলোতে এই যা খানিকটা জল জমে কাদা হয়ে থাকে।

আজ বড়দা আসেনি। আমিই বড়ো। তাই আমিই শুধালাম, "কী হয়েছে, দাদুভাই?"

"গর্ভপাত জানো, দাদুভাই? যে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আশা, আলো দেখার বাসনা নিয়ে চলে যায়... অঘ্রাণ মাসের এই বৃষ্টিপাত ও তা-ই— গর্ভপাত! আশ্বিনে ধানের সাধ খাইয়ে, বুকে করে যত্নআত্তি করে যে ধানগাছ ধরে রাখা হয়, তা নিজের মেয়ের চেয়ে কমকিছু নয়। আর ফসল তোলার সময়েই অনাসৃষ্টি বৃষ্টি... খেতময় ওই ধসে যাওয়া, ডোবা ধান চাষির পাঁজরের টুকরো!

কবিরা কাব্যি করে বলেন, আকাশে জামরঙের মেঘ জমেছে। কিন্তু মেঘ তো জমে চাষির বুকের ভেতরটাতে, চাঙড়ার মতো গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে... কান্না হয়ে ঝরে অঝোর ধারায়— বাপের কান্না! আমি সেই কান্নাই কাঁদছি গো আজ।"

আমার প্রশ্নটাই বিশু করে বসল, "দাদু, সাধ তো আমার ছোটোপিসির হল, আমি মাছের মুড়ো খেলুম, কিন্তু ধান গাছের সাধ কী করে হয় গো?"

"কেন? খোল খাবে, সার খাবে! গাছ গাছের খাবার খাবে! তাই না, দাদু?" লটকন বলল।

এবার বাবাঠাকুর হেসে ফেললেন।

"হ্যাঁ, লটকনবাবু ঠিকই ধরেছেন। যে-কোনো সন্তানসম্ভবা মা-কে, তার সন্তানের মঙ্গলকামনায় সাধভক্ষণ করানো যায়। এ এক বোধ, যা মাতৃত্বকে ছুঁয়ে আছে। মা যদি মন্দির হয়, এ মন্দিরের পৈঠা।

আমি যে বলেছিলাম মা সনকার কাছে মানত করে গেছিলাম। আবার ফিরে এসে ছলনের ঘোড়া-পুতুলটি খুলতে হত। তাই কয়েকদিন আগে আমি মা সনকাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখনই এই অদ্ভুত রীতি দেখার সুযোগ হয়েছিল। ধান গাছের সাধভক্ষণ বা নল সংক্রান্তি।

আমি যখন সেখানে গেছি, তখন আশ্বিন শেষ হয়ে আসছে। যে গৃহস্থবাড়িতে আমি উঠেছি, তারা আমার গুরুভাইয়ের শিষ্য। গুরুদেব বলে আমাকে থাকতে দিয়েছে। সন্ধ্যায় হাটে থেকে হাঁড়ি, কড়া কিনে এনে সাজাচ্ছে। ভেবেছিল আমি স্বপাক আহার করব। সাধারণত বামুনঠাকুররা এমনটাই করে থাকেন। কিন্তু আমার যে পাঠশালা অন্য, তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেনি।

বিপিনদা কইতেন, 'তুমি নিজের পৈতে ও লজ্জা সরিয়ে যখন মানুষের কাছে বসতে পারবে অর্থাৎ নিজের অহং আর লাজ যখন ত্যাগ করতে পারবে, তখন মানুষের একান্ত আপন হয়ে যাবে।'

আমাদের বিপ্লবীদের এই জনসংযোগ বড়ো প্রয়োজন ছিল। যতীনবাবুকে দেশের মানুষ ডাকাত বলে সন্দেহ করেছিল অবধি... এ বড়ো খেদ। সেই সন্ধ্যায় আমিও তাই ওই পরিবারের একান্ত আপন হয়ে গিয়েছিলাম। এই যেমন তোমাদের দাদুভাই হয়েছি। সবাই 'বাবাঠাকুর' বললেও তোমরা যেমন আমাকে 'দাদুভাই' বলে ডাকো, ঠিক তেমন!"

"যা-ই হোক, আর বিক্ষেপে যাব না। বরং এসো, তোমাদের সেই নল সংক্রান্তি বা সাধ ভক্ষণের কথা বলি। একটু গোড়া থেকে বলি, অধৈর্য হোয়ো না ভায়েরা।

পুকুর হল সর্বোত্তম সৃষ্টি তথা প্রজননক্ষেত্র। কারণ মাছ প্রতিমুহূর্তে পুকুরে জন্মাচ্ছে এবং বড়ো হচ্ছে। এইভাবেই প্রজননের চক্রটি চলছে অবিরত।

তাই একটি পুকুরের পাশে এই রীতির প্রারম্ভিক স্থাপনা হয়। পুকুরপাড়ে যদি কোনো বহুপ্রসবী গাছ, যেমন কয়েত প্রভৃতি গাছ থাকে, তার তলটাতেই নিকিয়ে, মুছে মা ষষ্ঠীর পাট করা হয়। মাটি দিয়ে গড়া হয় মা ষষ্ঠীর প্রতিমা। তার সম্মুখে পায়ের কাছে রাখা হয় ছোটো-ছোটো মাটির পুতুল। এগুলোই মায়ের তাবড় সন্তান, অর্থাৎ আমরা। 'আমরা'-র অর্থ বুঝলে তো, ভাই? 'আমরা' কথার অর্থ কিন্তু কেবল মানুষ নয়; বরং মানুষ, পশু, সরীসৃপ, বৃক্ষ— সবই এই অনন্ত সংসারের অঙ্গ।

মায়ের হাতে মায়ের পাশে রাখা হয় একটি শাখদণ্ড। এই শাখদণ্ডকে অঞ্চলভেদে 'মন্থনদণ্ড' বলে শুনেছি। কিন্তু আদতে ভাবটি হল, মা যেমন হাতপাখার দ্বারা আমাদের শাসন করেন, তেমনই এই দণ্ডের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে শাসন করছেন।

আর এই দণ্ডটি কিন্তু অনেকখানি আমাদের সেই নবপত্রিকার মতো; তালপাতা, কচুপাতা, কেয়াপাতা, বাঁশপাতা সবাইকে বেঁধে দেওয়া হয় ওই দণ্ডে। অর্থাৎ তামাম বৃক্ষাদি হল আমাদের রক্ষক।

'নল' হল মূলত এক ধরনের প্রতিষেধক। বোয়ালপাতা কিংবা অললি পাতায় মূলত এই প্রতিষেধক বাঁধা হয়।"

আমি হাত তুলছিলাম। দাদু থামালেন।

"এখানে এসে পাতার খুব একটা চল দেখি না। সেই পাতায় প্রতিষেধক মুড়ে গাছের গোড়ায় রেখে সদ্য ফুলধরা ধান গাছের আয়ুবৃদ্ধি করা, গর্ভবতী ধান্য-মায়ের জীবন সুরক্ষিত করার প্রথাই হল নল সংক্রান্তি।

কেঁউ, কেঁই বা তেঁতুল, কাকুড় লাড়ি, ওল, বেল, নীল আদা, পাটের ছাল এবং জটা— এইগুলিকে মাঠে-মাঠে ঘুরে দু'-তিনদিন ধরে জমান চাষিবউরা। শিলপাটায় পিষিয়ে সেটা দিয়েই তৈরি হয় মণ্ড। সেই মণ্ড অল্প-অল্প রাখা হয় বোয়ালপাতার বুকে। তারপর নতুন ওঠা পাটকাঠিতে গাঁথা হয় সেই বোয়ালপাতায় বাঁধা মণ্ড। এইটেই নল।

লাল টকটকে শালুক ফুল আর বেলপাতা, সিঁদুর দিয়ে চাষিবুড়ো উৎসর্গ করেন নল-কাঠিদের। উঠানের তুলসীতলায় কলাপাতা বিছিয়ে রেখে দেওয়া হয় কাঠি। সারারাত শিশির মেখে ভিতরের মণ্ডখানি ভেপে তৈরি হয় সাক্ষাৎ মহৌষধি। ভোর হলেই শুরু হয় নল পোঁতা।

প্রথমে সেই চাষিবুড়ো আতপ চাল, গুড়, তাল পাটালি, তাল শাঁস মেখে মায়ের ভোগ চড়িয়ে খেতের ঈশানকোণে গাঁথেন নল। তারপর গাছের গোড়ায় পুঁতে দেওয়া হয় আরও নল। তুলসীতলা, খামার, মরাই, মন্দির... আস্তে-আস্তে সর্বত্র পোঁতা হয় নল। নলপোঁতা যেন মা লক্ষ্মীকে আবাহন দেওয়া; আবাহন দেয়া মা ষষ্ঠীকে— মা, তোমরা এসো, আমার গর্ভবতী ধান্য-কন্যাকে দু'হাতে আগলে রাখো।

ধান গাছের গোড়ায় যে জল জমে থাকে, সেই জল ঘটি করে তুলে নিয়েছেন চাষিবুড়ো। ছড়িয়ে দেন নিজের উঠানের র্বত্র, কারণ ওই জলেই তাঁর ধান জন্মেছে, তাই ওই জল রীর গর্ভজলের মতোই পবিত্র।

দাদুরা, আমাদের বঙ্গসংস্কৃতি বড়ো বেশি আদিম, বড়ো বেশি মাটির গন্ধে মাখা! আর জানো তো, 'মাটি' শব্দে 'মা' আছে; তাই আমরা 'মা-প্রধান'।"

: নবান্ন - আঘ্রাণ লক্ষ্মী :

আমরা চুপচাপ বসেছিলাম। কিছু কথার ওজনই অমন হয়, কথা এগোনো যায় না।

দাদু তথা বাবাঠাকুর আবার বলা শুরু করলেন, "মা আসেন, মা রসেন, মেয়ে থয়/ আমার এ কানা ঘর আলো করে রয়।

কুয়াশাভাঙা মিঠে রোদে ভিজে নরম-কড়া হয়ে আছে মাটির বুক। পরম আদরে আড়াই মুষ্টি বা আড়াই মুঠি ধান কেটে, লালপাড় কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে নিঃশব্দে চাষি পা বাড়ান বাড়ির অভিমুখে। এ যেন পিতা তাঁর মেয়ের হাত ধরে বাড়িতে আনছেন।

এতদিন ধানগাছের কাণ্ড টিপে ধানের পুষ্টি বুঝেছেন। অধীর অপেক্ষা করেছেন মেয়ের ঘরে আসার, আজ সেই আসার পালা।

মা অর্থাৎ চাষিবউ বসে থাকেন দ্বার আগলে। পিঁড়ের ওপর মেয়েকে নিয়ে দাঁড়াবেন উনি। পা ধুইয়ে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে, আতপ-কলার নৈবেদ্য সাজিয়ে বাপ-বেটিকে একসঙ্গে ঘরে তুলবেন। মেয়ে এবার বাপের বাড়ি ক'টা দিন লক্ষ্মীশ্রী হয়ে থাকবে। আলো করে থাকবে ঘরের কোনা।

চৈতে মুগের ডালে পোস্ত আর বড়ি, কুদরি ভাজা দিয়ে মেয়েকে ভাত বেড়ে দেবেন। থাকবে পঞ্চ-ভাজার ব্যঞ্জন। দুই ঝোলের পদ।

কার্তিক সংক্রান্তিলগ্ন হল ধান কাটার আগের ধান্যলক্ষ্মী পূজার চিরাচরিত ব্রত। এমন এক ব্রত যা যুগ-যুগান্তর ধরে অক্ষয় করে গেছে, বাঙালির অনুভূতি আবেগ।

অগ্রহায়ণ মাস পড়লেই চাষিদের মধ্যে হলুস্থুল। ধানটি কাটা হবে। মেয়ে ছেলে বিয়োবে।

নতুন চাল যে-দিন সেজেগুজে ঝাড়াই-মাড়াই হয়ে ঘরে ঢোকে, সে-দিন নবান্ন। নবান্ন শালিধানের আগমনের উৎসব। নবান্ন মরাইপূজার উৎসব। নবান্ন ধান্যপূজার উৎসব, মা ধান্যলক্ষ্মীর পূজা।

দেবী ধান্যলক্ষ্মী ফসল-মাতা, কমলামাতা। তার সর্বাঙ্গের ভূষণ ফসল— ধান্য। পাসুলি, গোট, বিছেহার, নরিহার— সবই অন্ন। ধানের খোসার ন্যায় রোদ-রাঙা তাঁর গাত্রবর্ণ। 'কমলামঙ্গল' বলছে—

পদাঙ্গে লক্ষ্মীর অঙ্গে আলতা পরিধানে।
কিরণ দেখিতে যেন আলতা সমানে।।
তবে তো কনকচূড় পরিলেন পাসুলি।
নুপুর গরুড়ধান্য সীতাভোগগুলি।।
বাঁকমল পাতামল কামিনী উজ্জ্বলে।
কিঙ্কিণী জামাইনাড়ু আর পদ্মদলে।।
খাইহার ধানের মাল্য পরিল গলায়।
দেসুতি শীতলজীরে হরিভোগ তায়।।
পারিজাত ধান্যের পরিলা বক্ষহার।
উরুর উপরে পরেন বড় শোভা তার।।
সূর্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পড়িল।
নয়ানে অঞ্জন লক্ষ্মীকাজল পরিল।।
মুক্তাশাল সিঁথায় সিন্দুর শোভা পায়।
কবরী আঁটিল ধান্য কাবেরীজটায়।।
লক্ষ্মীভোগ পূণ্যভোগ খোঁপায় রাখিল।
মুক্তঝুরি পাটখোপ পিঠে তো দুলিল।।

মা ধান্যলক্ষ্মী পূজার আয়োজনটি ছিল সহজ-সরল, অনাড়ম্বর। ধানের গোছকে আলতাপেড়ে শাড়ি পরিয়ে প্রতিস্থাপন করা হত। নতুন কোটা চালের পায়েস রাঁধতেন মা। অল্প করে চাল কোটা হত। নৈবেদ্য হিসেবে চকচকে করে নিকানো হত মরাইয়ের (গোলাঘর) নিম্নগাত্র। মাজা হত তার গা। ধূপ-ধুনো দিয়ে এঁকে দেওয়া হত লক্ষ্মীপাট। সেই লক্ষ্মীপাটে কোথাও আঁকা থাকত ছড়া। আবার কোথাও মা লক্ষ্মীর পদচিহ্ন।

এরপর প্রতিদিন নিয়মিত সন্ধ্যাবাতি জ্বলত মরাই-ঘরের বাইরে। মা-কে প্রণাম করে প্রথম ধানের পালি-টি ঢেলে দেওয়া হতো মরাইয়ের গর্ভে। তারপর আস্তে-আস্তে মরাই ভরে উঠত শস্য-শ্যামলা মায়ের সোনার ফসলে। সারা বছরের রসদ। বুভুক্ষুর খাজাঞ্চিখানা।"

কথা শেষ করে বাবাঠাকুর উঠে পড়লেন, চা করতে। শীতখানা জমিয়ে পড়েছে। আমাদের বাড়ি পাঠানোর আগে আর একবার গুড়-চা খাওয়াবেন। কিন্তু একটুখানি গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন।

"তোমাদের আর একখানা রীতির কথা বলাই হয়নি। কাকবলির সেই রীতি যেমন চমকপ্রদ, তেমনই ব্যবহারিকভাবে সংযুত।"

: কাকবলি :

"নবান্ন তো সবাই জানে। কিন্তু বরিশাল, আটাশালের দিকে এক রীতি আছে। নতুন চালের রান্না সর্বপ্রথম উঠানের কোণে কাকেদের উদ্দেশে রাখা হয়। ছড়া কেটে আহ্বান করা হয় তাদের,

কো কো কো, আমাগো বাড়ি শুভ নবান্ন।
শুভ নবান্ন খাবা কাকবলি লবা
পাতি কাউয়া লাথি খায়,
দাঁড় কাউয়া করা খায়,
কো কো কো, মোর গো বাড়ি শুভ নবান্ন।

মনে করা হয়, কাক পূর্বপুরুষের প্রতীক। তাই তো সে ঘরের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। তো যা-ই হোক, কাক যেই খুঁটে খেতে শুরু করে, গৃহে শুরু হয় আলপনা এবং নবান্নের উদ্যোগ। এই অনুষ্ঠানটিই 'কাকবলি' নামে পরিচিত।

কাকবলির পর নতুন চালের ভাতের সঙ্গে রান্না করা কমপক্ষে পঞ্চব্যঞ্জন, পিঠেপুলি খাওয়াই রীতি।

তোমরা এরপর বড়ো হবে, পড়াশোনা শিখবে, যখন যুক্তির কষ্টিপাথরে সব কিছু বিচার করতে শিখবে, তখন বুঝবে এ কী ভীষণ প্রকৃতি-শিক্ষা! পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রকৃতিরক্ষার এক দারুণ প্রয়াস এই রীতি।

কাক হল আমাদের গৃহের সবথেকে কাছাকাছি বসবাসকারী পাখি। সবথেকে কাছাকাছি যে সমস্ত প্রাণীরা বসবাস করে, তাদের উপর অত্যাচারটি সবথেকে বেশি হয়। তাই তাদের রক্ষা করার এটা একটা প্রক্রিয়া। সমস্ত পাখ-পাখালিকেই খেতে দেওয়ার রীতি রয়েছে। তবে, কাকের সুবিধা, আমাদের যা আহার্য সেটাই সে গ্রহণ করে এবং এইভাবে তাদেরকে পূর্বপুরুষ হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিলে আমরা খানিকটা সদয়ও হব।

যাক গে, অনেক বেলা হয়ে গেল, চা-টা করি। তোমরা গরম-গরম চা খেয়ে তেল মেখে পুকুর থেকে নেয়ে এসো।"

।। অশ্বত্থ ব্রত ।।

"চত্তিরের দখিনা বাতাস ছাড়লে মন অকারণেই উছলে ওঠে। খালপাড় দিয়ে, দেবদারু-বন আর তালখামার দিয়ে হেঁটে গেলে, কান কালা করা, হু-হু ওলট-পালট বাতাস পরিস্রুত হয়ে ছড়ছড়ে নরম হাতপাখার বাতাস হয়।

ভিজে ঘামজর্জর শরীর বাতাসের পরশে একটু-একটু করে জুড়িয়ে ঠান্ডা হয়। অলস এক আবেশে চোখ বুজে আসে... মনে হয় এখানেই গামছা পেতে চোখ বোজাই।

তা-ই বুজিয়েছি, তারপর উঠে দেখি উলটোদিকে এক রমণী বসে আছেন সন্তান কোলে। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাছাটি কেঁদে উঠল আর সেই মা অমনি উদলা হয়ে সন্তানকে স্তন দিতে লাগলেন।

সদ্য তখন মাতৃসাধনার পাঠ নিচ্ছি। দৃষ্টি, আড়ে তখনও কুণ্ঠা। অনুতাপের আগুন আর উপলব্ধির শৈত্য— দুই-ই ভীষণ। ছি ছি! এ আমি কী দেখলাম! লজ্জায় মুখ নামিয়ে, গুটিয়ে গেলাম।

গুরুদেব তখন হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। আমার দ্বিধা লক্ষ করেছিলেন ইনি। সন্ধ্যায় হবিষ্যি পাকের সময় কাছে ডাকলেন। পিঠে হাত বুলিয়ে কইলেন, 'গাছ আর ফলের যোগ কী, ভূপেন?'

আমি আচমকা এমন প্রশ্নে হতভম্ব হয়ে বিস্ময়ে মাথা নাড়লাম।

গুরুদেব মৃদু হেসে কইলেন, 'বোঁটা! কী? তোর অশ্লীল লাগল, নয় রে? ওরে পাগল, বোঁটা না থাকলে গাছের পীযূষ

(সুধা) সন্তানসম ফলের দেহে এসে তাকে পুষ্ট করবে কী করে? গাছ দেখে লজ্জা করস না আর মানুষ-গাছ দেখলে লজ্জা? কেন? সে ধুতির, শাড়ির রাখঢাক করে বলে? হতভাগা কোথাকার! উপলব্ধির গোড়ায় সাধনের খোল-সার দে!'

তোমাদের এ-সব কথা কেন বলছি, জানো? যাতে সমস্ত জিনিস ঘষেমেজে দেখে নিতে পারো! তোমরা আজ নয় কাল বড়ো হবে। বোধ এমন জিনিস, শুরু থেকে গোড়ায় শাঁসজল দিলে গাছটি বৃক্ষ নয়, মহীরুহ হয়।"

আজকে কথায়-কথায় গাছ-পালার কথা উঠে আসছিল। আসলে আজ চৈত্রের সংক্রান্তি, মাকুড়িরা দলে-দলে আসছে আর আমাদের গাঁয়ের একমাত্র অশ্বত্থ গাছটির গোড়ায় জল ঢেলে চলেছে। সেই দেখতে দেখতে ভারী কৌতূহল লেগেছিল। উপকথাটি জানি। কিন্তু অশ্বত্থ গাছই কেন!

এদিকে খালপাড় দিয়ে বাবাঠাকুরের কাছে আসতে বড়ো দ্বিধা হচ্ছে। আজ গ্রামের সকল মহিলারা অশ্বত্থ পাতা কুড়িয়ে খালেই স্নান করছেন এবং সেখান থেকে উঠে খালপাড়ের অশ্বত্থ তলায় দুই ঘটি করে জল ঢেলে প্রণাম করছেন। ভারী লজ্জা করছিল। মাথা নীচু করে পার হয়ে আসছিলুম। আর তখনই বাবাঠাকুর দেখে ফেলে আমাদেরকে নিয়ে পাঠ দিতে বসেছিলেন। প্রথম শিক্ষাটি ওই কারণেই।

পাঠের ওজন মাথায় ভালো করে ঢোকেনি। প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি। ভণিতা না করে কইলুম, "দাদু, কিন্তু অশ্বত্থ গাছই কেন? অন্য তো অনেক রকম গাছ হয়!"

বাবাঠাকুর একখানা বুড়ো অশ্বত্থপাতা হাতে নিয়ে রহস্য করে বললেন,

"শালপ্রাংশু অ-বিরোধ, অজর
হয় কর্ণ উল্লম্ব পত্রাধর।

অর্থাৎ, শাল গাছের মতো অক্ষয় আয়ুসম্পন্ন, সদাসবুজ এবং যার পত্র অশ্বের কর্ণের ন্যায় উল্লম্ব ও চ্যাপটা— তা-ই অশ্বত্থ। সতীলক্ষ্মীর পুণ্য ভস্মে তার জন্ম।"

বড়দা উশখুশ করতে শুরু করেছিল। বাবাঠাকুর থামালেন, "চলো, মাঠের দিকে যেতে-যেতে..."

: পৌরাণিক মাহাত্ম্য :

"কালনেমিকে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। তিনি ছিলেন রাবণের মামা। এই কালনেমির পুত্রী ছিলেন বৃন্দা। ভীষণ সতীসাধ্বী নারী, স্বামী জলন্ধরের চিন্তায় তিনি সবসময় আরাধ্য বিষ্ণুর কাছে জপে রত থাকতেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁকে রক্ষাও করতেন। কিন্তু গোল বাধাল জলন্ধরের দুঃসাহস। সে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে বসল। অসহায়, পীড়িত ইন্দ্রদেব এসে পড়লেন মহাদেবের পদপ্রান্তে। মহাদেব জলন্ধরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হলেন। আর অন্যদিকে তার স্ত্রী-ও শ্রীবিষ্ণুর কঠিন তপস্যায় বসলেন; তপস্যা পূর্ণ হলে, আরাধ্যের কাছ থেকে আপন স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করে নেবেন। এমতাবস্থায় সবাই বিষ্ণুকে এসে ধরলেন। অসহায় শ্রীবিষ্ণু উপায়ান্তর না দেখে জলন্ধরের ছদ্মবেশে বৃন্দার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। বৃন্দা তাঁর স্বামী যুদ্ধ জিতে অক্ষত ফিরে এসেছে ভেবে তপস্যা ভঙ্গ করেন। আর সেই সময়েই মহাদেব জলন্ধরকে হত্যা করেন।

ক্রোধে, দুঃখে, বঞ্চনায় কাতর হয়ে বৃন্দা নিজের আরাধ্যকেই অভিশাপ দিতে যান। তিনি এমনই সতী ছিলেন

যে, শ্রীবিষ্ণু পর্যন্ত ভয়ে কাতর হয়ে পড়েন।

তখন শ্রীবিষ্ণু তাকে বর দেন, বৃন্দার দেহত্যাগের পর সেই ছাইভস্ম হতে জন্ম নেবে তুলসী, ধাত্রী (আমলকি), কিংশুক ও অশ্বত্থ; যা কালে-কালে আপন চরিত্র হেতু স্মরণীয় হবে।"

এতক্ষণ চেপে রেখেছিল। এবার ভস করে ঠেলে দিল বড়দা, "কিন্তু, দাদু! শ্রীবিষ্ণুর একটা অসুরের অভিশাপের থেকে ভয়!"

বাবাঠাকুর গম্ভীর স্বরে বললেন, "যিনি কর্মে সৎ এবং নিষ্ঠাবান, যিনি তাঁর কর্তব্য ও কর্মে সদা অটল, তাঁর অভিশাপ ফলে যায় বইকি। কর্মও একপ্রকার ইষ্ট।"

এমন সময় অশ্বত্থতলা থেকে উলুধ্বনি ভেসে এল। আমরা সবাই বাইরে এলুম, এবারে মন্ত্র বলবেন সমবেত নারীগণ,

"উজোতে পারলে ইন্দ্রের শচী।
না উজোলে কৃষ্ণ-পদ দাসী।।"

সেদিকে তাকিয়ে বাবাঠাকুর কইলেন, "এই অশ্বত্থ ব্রত বা বৃক্ষোপাসনার ব্রতগুলি নিয়ে অনেক কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সবকিছুর মূলেই মানুষের অহংকার ও উদাসীন্য আর বৃক্ষের উদারতা— এইটাই ফুটে ওঠে। আমাদের পূর্বপুরুষরা নিজেদের ক্রমবর্ধমান ক্ষুধাকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। তাই, বৃক্ষকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে তাদেরকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু তা হওয়ার নয়...

"কোনো এক সময়, কোনো এক দেশে এক ব্রাহ্মণের এক সুন্দরী কন্যা ছিল। রূপের দেমাকে সেই কন্যা ধরাকে সরা জ্ঞান করত। তার সেই অহংকারের আগুনে ঘৃতাহুতি দিল রাজার উপযাচক হয়ে ব্রাহ্মণকন্যার পাণিপ্রার্থনা।

কন্যার মা বৈশাখে পাঁচটি পত্র নিয়ে অশ্বত্থ ব্রত পালন করে যান। বৃক্ষদেবতার কাছে আপন পরিবারের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি প্রার্থনা করে যান।

অথচ সেই কন্যা অশ্বত্থেরই আশীর্বাদে রাজার ঘরের বধূ হয়ে অশ্বত্থকেই অপমান করে! সে ব্রত তো করেই না, উপরন্তু 'অশ্বত্থ' নাম শুনলে সে নাক সিঁটকায়— প্রাচীন বৃক্ষ, এবড়ো-খেবড়ো অমসৃণ গা, পাখির বাসা, ইঁদুরের গর্ত তায় লাল পিঁপড়ের ঢিবি ওই গাছকে কে সম্মান করে!

বৃক্ষের তলা দিয়ে যখন সখীদের সঙ্গে সে নাইতে যায়, বৃক্ষকে নিয়ে হাসাহাসি করে। বৃদ্ধ অশ্বত্থ সবই শোনে। কিন্তু পিতা কোনদিন 'কু' হতে পারে না। তাই এ-সবই চপলা কিশোরীর চপলমতিত্ব ভেবে ক্ষমা করে দেয়।

কিন্তু মাতা পার্বতী সবই দেখলেন এবং মনে-মনে কন্যাটির এহেনও অহংকারের জন্য ভারি ক্রুদ্ধ হলেন।

একদিন সেই কন্যা পিতৃগৃহে এসেছে আর অমনি ডাকাত পড়েছে। ডাকাতরা গয়নাগাঁটি সব কিছু নিয়েও তাদের মন ভরে না। এমন সুন্দরী রমণী তারা কি ছাড়তে পারে! তারা সেই কন্যাটিকে নিয়ে চলে ঘোড়ায় চাপিয়ে। কন্যার অসহায় ক্রন্দনে সবাই সচকিত হয়। রাজবাড়িতে খবর যায়। কিন্তু ডাকাতরা চলেছে ঘোড়ায় চড়ে, কেউ তাদের আটকাতে পারে না। এদিকে অশ্বত্থ বৃক্ষ সমীপে যতই আসে, কন্যা ততই হতোদ্যম হয়ে পড়ে। কারণ, এই বৃক্ষের পরে এই গ্রামের সীমানা শেষ। অবশেষে সেই অশ্বত্থকেই 'বাবা' সম্বোধন করে তাঁর কাছে কেঁদে পড়ল সে।

সে-রাতে কোনো এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে, সে-ঘটনা কী তা জানা যায় না। সেই ডাকাতদের গতি সেখানেই রুদ্ধ হয়। এক প্রহরে সমবেত জনগণ ও রাজার সৈন্য সেই

ডাকাতদের গ্রেফতার করে। এ-দিকে কন্যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অনেক সাধ্যসাধনার পর কন্যা বৃক্ষকোটর হতে বেরিয়ে আসে। তার তখন অহংকার অপদ্রব হয়ে বয়ে গিয়েছে অশ্রুজলের সঙ্গে। দিব্য উপলব্ধি হয়েছে তার, ওই বৃক্ষকোটরে মাতা পার্বতী অবস্থান করে তাকে বৃক্ষসার বুঝিয়েছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে, সেই কন্যা কেঁদে পড়ে বৃক্ষতলে। মা পার্বতীর আখ্যান প্রচার করে প্রতি চৈত্র সংক্রান্তি হতে সমগ্র বৈশাখ জুড়ে পালন করে বৃক্ষব্রত।

পাঁচটি পাতা কুড়ানো হয় দেখবে। পাড়া অর্থাৎ গাছকে কষ্ট কিন্তু দেওয়া হয় না।

কচি পাতা হল সন্তানধারণ, কাঁচা পাতা হল সোনার বরণ, পাকা পাতা দীর্ঘায়ু, শুকনো পাতা সুখশান্তি, ঝুরঝুরে পাতা গয়নাগাঁটি— এ আমাদের মায়েদের নিজেদের গড়ে নেওয়া। এসব দানাদার গো, উপরে কড়মড় চিনি, ভিতরে ভাবের রস!

যা-ই হোক, সব মায়েদের স্নান হয়ে গেছে। এবার আমরা ঘাটে যাই, বেলা বয়ে এল।

।। ছড়া বৃত্তি ।।

ভেবেছিলাম নটেগাছটি এখানেই মুড়োবে, কিন্তু বাবাঠাকুর, মানে আমাদের দাদুভাই চাঁপানটের দানা বুনে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন আমরা বাবাঠাকুর অর্থাৎ দাদুভাইয়ের কাছে একটা পুরাতন আবদার শুধতে এসেছিলুম। সেই যে গো আমাদের ছড়া বলেছিলেন না, বলেছিলেন আর একদিন কইবেন। আজকে এসেছিলুম আরও কয়েকটা ছড়া জানা যায় যদি। দাদুভাই নিরাশ করেননি। নিজেই আবৃত্তি করেছিলেন ছড়াখানা...

"খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল বর্গি এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে?
ধান ফুরল, পান ফুরল খাজনার উপায় কী?
আর ক'টা দিন সবুর করো রসুন বুনেছি।।
ধনিয়া পিঁয়াজ গেছে পচে সর্ষেখেতে জল।
খরা-বন্যায় শেষ করিল বর্ষের ফসল।।
ধানের গোলা, চালের ঝুড়ি সব শুধু খালি।
ছিন্ন কাপড় জড়িয়ে গায়ে শত-শত তালি।।"

১৭৪২ থেকে ১৭৫১— টানা নয় বছর সুবে বাংলা বর্গীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মারাঠা সৈন্যদলের স্থায়ী বেতনভুক সৈনিক নয়, ভাড়াটে ছিল এই বর্গীরা। ফলে সেনাসুলভ শৃঙ্খলা এদের ছিল না।

আমাদের সীমানার পশ্চিম অঞ্চলগুলিতে লুটতরাজ চালাত এরা। ঘোড়ায় চড়ে আসত, যা পেত তা-ই ছিনিয়ে, জ্বালিয়ে চলে যেত। সে এক অশেষ দুর্গতি।

"আমার দেশে তো কোন রাজা ছিল না, দাদা?" কাশেম কইলে।

"ছিল তো! বাংলায় তখন চলছে আলিবর্দি খাঁ-র শাসন। তিনি হলেন সিরাজ-উদ-দৌলার দাদু। মস্ত বীর। কিন্তু মারাঠারা ছিল ভারি ধুরন্ধর; ঠিক বুলবুলি পাখির মতো। বুলবুলি পাখি মস্ত ধুরন্ধর। ধান পাকলে, উড়ে-উড়ে কীভাবে যে খোসার ভিতর থেকে পাকা ধানটি তুলে নেয় তা কেউ বলতে পারে না। তাই তো এমনধারা রূপক।

'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কীসে' — অর্থাৎ বুলবুলির মতো সব কিছু লুট করে নিয়ে গেছে মারাঠারা, এখন রাজাকে খাজনা দেব কীভাবে?

ধানের সঙ্গে-সঙ্গে এই যে দেখছ পানের বরজ, এই পানও কিন্তু আমাদের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অবলম্বন ছিল।

তখন এখনকারর মতো তামাক, চা প্রভৃতি নেশাদ্রব্য এসে পড়েনি। মানুষ পান রীতিমতো যত্ন করে খেতেন। বর্গীরা এতই বদ, বরজকারীর কাছে অর্থ মেগে না পেলে বরজগুলিতেও তারা আগুন ধরিয়ে নষ্ট করে দিয়ে যেত! তাহলে তারা কর বা খাজনা দেয় কীভাবে, বলো দেখি!

সঙ্গে জুটত সংবৎসরকালের অজন্মা, খরা, বন্যা— ক্ষেত্রবিশেষে তিনটিতে মিলে অবস্থা আরও ভয়াবহ করে তুলত। খরায় ধান বোনা যায় না। আবার ধানের পর যেই হলুদ, ধনে, পিঁয়াজ বোনা হল, অমনি অকাল বর্ষণ। সমস্ত চাষ নষ্ট... খেতের গলা অবধি জল! সে-সময় গ্রামের মানুষদের দুর্গতি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছে ছিল যে, বসনের কাপড়টুকুও জোটাতে হিমশিম খেতে হত তাঁদের।

শেষমেশ ১৭৫১ সালে এক সন্ধি হয়। অসহায় আলিবর্দি খাঁ মারাঠাদের হাতে উড়িষ্যাকে রাজস্ব হিসাবে ছেড়ে দেন। বাংলা নিস্তার পায় বর্গি-জুলুমের হাত থেকে। তবে নবাব অবিচার করেননি। কয়েকদিনের মধ্যেই কায়দা করে মারাঠাদের দলপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করেন এবং সমগ্র সুবে বাংলা রক্ষা পায়।

কিন্তু ওই, যে নারাঙ্গার দগদগে ক্ষত প্রেমচিহ্ন হয়ে রয়ে যায় বর্গি হানার এই ভয়াবহ স্মৃতি... বাংলার ঘুমপাড়ানি গান থেকে ছড়ায় পাকাপাকি রয়ে যায়।

আমরা চাটাই গুটিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। বাবাঠাকুর বললেন, "দাদুভাই, ইকড়ি মিকড়িটা কেউ বলো তো..."

আমরা পাঁচজনে সমস্বরে পড়া শুরু করলাম,

"ইকড়ি মিকড়ি
চাম-চিকড়ি,
চামের কাঁটা মজুমদার।
ধেয়ে এল দামোদর
দামোদরের হাঁড়ি-কুঁড়ি।
দাওয়ায় বসে চাল কাঁড়ি।
চাল কাঁড়তে হল বেলা,
ভাত খাও'গে দুপুরবেলা।
ভাতে পড়ল মাছি,
কোদাল দিয়ে চাঁছি।
কোদাল হল ভোঁতা
খা কামারের মাথা।"

পড়া শেষ হতে দাদুভাই অর্থাৎ বাবাঠাকুর খানিকক্ষণ থামলেন। তারপর মৃদুস্বরে কইলেন, "এ-ও এক ঐতিহাসিক সময়ের নিদর্শন। আকবর বাদশাহ যখন দেহ রাখলেন, জাহাঙ্গির হলেন মোগল সম্রাট। বাংলায় তখন স্বর্ণযুগ— বারো ভুঁইঞাদের অন্যতম প্রতাপাদিত্য নিজেকে স্বাধীন নৃপতি ঘোষণা করে ধূমঘাট বলে স্থানে গড় নির্মাণ করেছেন। সমগ্র যশোর তাঁর সুশাসনের সোনা ফলিয়ে চলেছে, অথচ তিনি মোগলদের একটিও কানাকড়ি দেন না।

অতএব যুদ্ধ বাধল। জাহাঙ্গিরের নির্দেশে সেনাপতি মানসিংহ বাংলায় এলেন প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করতে। মানসিংহ মরুপ্রদেশের লোক। এই জলা-জঙ্গলাকীর্ণ বাংলাদেশকে তিনি কী বুঝবেন! মোগলদের সবথেকে বড়ো সুবিধা ছিল তাদের ভার অর্থাৎ বিশাল সেনাবাহিনী— প্রায় লক্ষ লোক। 'চাম চিকড়ি' বা 'চামচিকি' বিপুল সেনাবাহিনীর রূপক।

এখন এই বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে নদী পার হওয়া বড়োই দুষ্কর ছিল। আর বাংলায় সবই পেটমোটা খরস্রোতা নদী। বাংলায় এই সকল বাধা অতিক্রম করতে তাঁকে সাহায্য করেন বাংলার তিনজন মোগলাধীন রাজকর্মচারী বা 'মজুমদার'। মজুমদার মূলত রাজকর্মচারীর পদবি, যাঁদের কাজ হত খাজনা বা রাজস্ব আদায় ও হিসেব রাখা। তাঁরা নিজেরাই প্রায় জমিদারের সমান।

এই তিনজন হলেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, ভবানন্দ মজুমদার এবং জয়ানন্দ মজুমদার। এঁরা এঁদের মহালে বিশাল সেনাবাহিনীর থাকার বন্দোবস্ত, বিপুলসংখ্যক নৌকা ও মাঝির জোগাড় করে দেন। তাই তো 'চামে কাটা মজুমদার' অর্থাৎ 'চোখের চামড়া নেই' যার, অর্থাৎ নির্লজ্জ-বেহায়া। নিজের মানুষের চামড়া কেটে (অত্যাচার করে) সেই অর্থ দিয়ে

বহিরাগত সৈন্যবাহিনীর খিদমত করছে নিজেরই মাতৃভূমিকে পরাধীন করার জন্য!

দামোদর ছিল কিংবদন্তি দুঃখের নদী। বর্ষায় দামোদরের বন্যা ছিল সাক্ষাৎ মহাকাল!" দাদু একবার কপালে হাত ঠেকালেন। "মানসিংহ যখন পারাপার হন, সে-সময় জলঙ্গীতে এমন ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা এসেছিল। সেই রূপককেই প্রবাদপ্রতিম বর্ষার দামোদরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

এতজনের খাবার আয়োজন করতে গিয়ে তাঁদের বেলা গড়িয়ে যেত। তাই তো চাল কাঁড়তে বেলা বয়ে যায়। একদিকে মজুমদারের দাওয়ায় মহাভোজ, অন্যদিকে হতদরিদ্র গ্রামের সাধারণ মানুষের ভাগ্যে একগাল মাছি!

অসহায়, দরিদ্র কৃষকদের অন্নচুরি। তাদের উপরে জুলুমের তারা কোথায় জানাবে? তাদের 'কোদাল' অর্থাৎ কোতোয়াল নিজেই তো তাদের ভক্ষক! তাই তাদের 'কোদাল ভোঁতা'; অতএব তারা এই অসহায় কামার, যারা কোতোয়াল বানিয়েছে, রাজ্য গড়েছে, তাদেরই মাথা আজকে ভোজ্য..."

বাবাঠাকুর থামলেন, "তাহলে বুঝতে পারছ তো, আমরা শুধু এদেরকে ছড়া ভাবি, কিন্তু এই ছড়ার আড়ালে যে কী চমৎকার লোকশিক্ষা রয়ে গেছে, আমরা কখনোই বুঝতে পারিনি। চলো, বেলা বয়ে এল। অন্য কোনোদিন, অন্য কোনো ছড়া নিয়ে তোমাদের সঙ্গে বসব।"

ওই যে চাঁপানটের/চাকনটের দানা বোনা হয়েছিল, তার ফসল যে ফলবে তা বেশ বুঝতে পারছিলাম। তাহলে আসব নাহয় অন্য কোনো দিন, ছড়ার চাক নিয়ে...



কারিগরি বিদ্যায় স্নাতক।
পেশায় কারিগরি মানোন্নয়ন পরীদর্শক।
নেশা কলম, বই এবং সিনেমা-সিরিজ।
লেখক অবসরে, ভালোবাসায়। আসল
কথা গল্প বলতে ভালোবাসি। কর্মজীবন
দেশ-বিদেশে বিস্তর ঘুরিয়েছে।
সেখান থেকেই গল্প জমানোর শুরু....
শেষ যেকোনো দিন।

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

ডিব্বুক
দেও
বিষহরি

প্রচ্ছদ : সৌজন্য চক্রবর্তী